মুনতাসীর মামুন

একাত্তরে গানে গানে জাগরণ

গান ইতিহাসের দলিল, বিশেষ করে দেশ বন্দনার বা শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে গান। জাতীয়তাবাদের ভিত্তি মজবুত করে গান। ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রচিত গান কীভাবে মানুষকে উতরোল করেছিল তা ঐ আমলের মানুষজনের স্মৃতিতে আছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর গায়ে গঞ্জে গাওয়া 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' মানুষকে বিষণ্ন ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আরো পরে লতা মঙ্গেসকার যখন গানটি গাইলেন খালি গলায় তখন আমাদের প্রজন্ম কি উদ্বুদ্ধ হইনি? আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে তখন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের একটি পরম্পরা তৈরি হয়েছিল। সেই সংগ্রাম মনে হয়েছিল ঐতিহ্য বা মোহিনী চৌধুরীর 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে' এখনও মন বিষণ্ন করে তুলে অজানা শহিদদের স্মৃতিতে। এভাবে, পুরনো গান, নতুন সময়ে নতুন অর্থ সৃষ্টি করে। এধরনের গান একটি বিশেষ সময়ের মানসিকতা বুঝতেও সহায়তা করে। যেমন, গত শতকের চল্লিশ দশকে গণনাট্যসংঘের শিল্পীদের গাওয়া গান। কমিউনিস্ট ঐক্য, মানুষের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের কাহিনি নিহিত ঐ গানে। এখনও সেই সব পুরনো গান নতুন অর্থ নিয়ে ফিরে আসে, যেমন এসেছিল একাত্তরে। ধরা যাক ঐ সময় হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরীর লেখা ও সুরারোপিত গান। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন, ঐ সময় গান, গণসঙ্গীত মানুষ-কে কীভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল।[১] যেমন, নৌ বিদ্রোহ নিয়ে সলিল চৌধুরী লিখেছিলেন, 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে'। গানটি গেয়েছিলেন ২৯ জুলাই ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকা এক হরতালের দিনে।[২] সেখানে যুক্ত হলো 'আজ হরতাল আজ ঢাকা বন্ধ'। সেই একই গান ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতে লাগল তখন আমাদের মনে হলো আলো ফুটবে প্রাণ জাগবে। বা ইন্টারন্যাশনালের 'আমরা করব জয়' তখন তো বটে এখনও কি উদ্দীপ্ত করে না। এভাবে গান সময় অতিক্রম করে।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যে গানগুলি গাওয়া হয়েছিল ১৯৭১ সালে তা আবার ফিরে এসেছিল এবং গানগুলি সমসাময়িক মনে হয়েছিল। এসব গান দু'ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রকৃত নির্ভর দেশপ্রেমের গান, যেমন, 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' বা 'আমার সোনার বাংলা'।

গান এক ধরনের নস্টালজিয়া তৈরি করে। দেশের প্রতি আমার অধিকার ভালোবাসা প্রকাশ করে। ১৯০৫-এ লেখা 'আমার সোনার বাংলা' একাত্তরে আমাদের জাতীয় সংগীতে [১৯৭২] রূপান্তরিত হয়। যদিও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আরেক ধরনের গান যা মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, শাসন শোষণ থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন, মুকুন্দদাস বা নজরুলের গান। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনুরাধা রায় এডোয়ার্ড সঈদের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যা বেশ যৌক্তিক। সাম্রাজ্যবাদ হলো প্রথমত ভৌগোলিক বেদখল; তাই সাংস্কৃতিক উপনিবেশ বিরোধিতার একটি প্রাথমিক কাজই হলো লোকালিটিটাকে আবার নিজের মত করে আবার দখল করা। দেখা ভূগোলটাকে পুনরুদ্ধার করা একটু একটু করে।[৩] ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে যে গানগুলি প্রচারিত হতো, তা শুনে আমরা ভাবতাম, জমিতো আমাদের, আস্তে আস্তে তা আমাদের অধিকারে আনতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের গান ছিল সেদিক থেকে, পাকিস্তানিদের হাত থেকে জমি নিজের দখলে নেয়া ও শাসন শোষণের অবসান ঘটানো।

গানের আবেদন সর্বজনীন, শিল্পের মতো, যে ভাষায়ই গান গাওয়া হোক না কেনো এর কথা না হোক সুরতো মন-কে স্পর্শ করবেই। পশ্চাত্যের ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূর্ছণা সবাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাকরণ মেনে শোনে না, তাকে স্পর্শ করে দেখেই শোনে। অনেক সময় ভাষা না বুঝলেও এর ছন্দ মানুষকে মোহিত করে। 'উই শ্যাল ওভারকাম' বাইবেলের ভাষ্য হলেও আজ সকল সংগ্রামে নিজেকে ও মানুষকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তা গাওয়া হয়। অনেক ভাষায় তা অনূদিত হলেও সুরটিতো সর্বজনীন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যেমন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে রকম ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়েই বিশ্ব দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদিক থেকে দেখলে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই বিস্তৃতি। ফরাসীরা বাধ্য হল ছেড়ে দিতে তাদের উপনিবেশ, উত্তর ভিয়েতনামে হ্যানয়-কে কেন্দ্র স্বাধীন ভিয়েতনাম, অন্যদিকে সায়গণকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ভার নিয়ে নিল যুদ্ধের। ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ধরলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বয়স চার দশক তো বটেই। এতো পুরনো হলে যুদ্ধ, অনেক সময় আবেগ হ্রাস পায়

কিন্তু আদর্শের তো বিনাশ নেই। সে কারণে, ১৯৭২ সালে ভিয়েতনামের পক্ষে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশের গুলি খেয়ে আমার পাশের ছাত্রটি মারা যান। ভিয়েতনামীরা হয়ত একথা জানেও না। আদর্শের জোর এমনিই।

ভিয়েতনাম মুক্ত হওয়ার ঠিক আগে বাংলাদেশ সবার মনোযোগ কেড়ে নিল। ঐ সময়, বিশ্বময় উদারবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও 'নির্দলীয়' মানুষের জোট গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের পক্ষে, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি, কেউ আগ্রহও দেখায়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গান এই বাঁধনে ভূমিকা রেখেছিল। 'বাংলাদেশ' নামের ব্রান্ডিং শিল্পীরাই করেছিলেন।

আমাদের এখানে মুক্তিযুদ্ধের বয়ান মানে বিজয় ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। প্রাথমিক আবেগ কেটে যাওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ বর্গ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গেজেটভুক্ত তালিকায় যারা আছেন তারাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা? তাহলে, আমার শিক্ষক অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ কোন ক্যাটাগরিতে পড়বেন যিনি প্রথমদিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য অবরুদ্ধ দেশে কাজ করে গেছেন। বা আমার চাচা অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। যিনি তাঁর বন্ধু 'গিয়াসের' সঙ্গে একত্রে কাজ করে গেছেন। তারামন বিবি অস্ত্রবারুদ পৌঁছে দিয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, উপাধি পেয়েছেন। এরকম কাজতো হাজার হাজার মানুষ করেছেন। আসলে অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম হওয়াই উচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে কমবেশি সবাই সক্রিয় ছিলেন, তাদের অবদান একেবারে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই আছে তবে এখানে তা প্রাসঙ্গিক নয়।

মুক্তিযুদ্ধ বহুমাত্রিক। মুক্তিযোদ্ধারা [যারা ফ্রন্টে অথবা গেরিলা হিসেবে যুদ্ধ করেছেন] এর একটি দিক মাত্র। বিশ্বময় মানুষের মুক্তি কামনায় বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা, গান গল্প, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, সারা বিশ্বের উদারবাদীদের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির জন্য এগিয়ে আসা—এ সমস্ত দিকগুলি উপেক্ষিত থেকে গেছে। যে আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে সে আমেরিকায় মার্কিনীরা কী প্রবলভাবেই না এগিয়ে এসেছিল। কে এসব ইতিহাস লিখবে।

মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিকতার একটি মাত্রা হচ্ছে গান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা বিবিসি বা আকাশবাণী থেকে কম ছিলনা। বিদেশেও বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট হয়েছে, গান বাঁধা হয়েছে, সেগুলির কথা বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত জানি কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাসটা অজানা। বিভিন্ন সময় টুকরো টুকরো নিবন্ধে আমি এই গানের আবেদন ও অবদানের কথা

লিখেছি। সে সব এখন এখানে একত্রিত করে ধারাবাহিক একটি বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি।

ইউরোপ আমেরিকায় বাংলাদেশ নিয়ে শিল্পীরা গান গেয়েছেন। এর ধরণ দু'রকমের। একটি হলো কনসার্ট যেখানে শিল্পীরা পছন্দমতো গান গেয়েছেন। টিকেট বিক্রির টাকা তারা বাঙালি শরণার্থীদের জন্য দান করতেন। অন্যটি হলো, কনসার্টে অন্যান্য গানের মাঝে বাংলাদেশ নিয়ে লেখা গান, যেমন, জর্জ হ্যারিসন বা এককভাবে বাংলাদেশ নিয়েই গান, যেমন, ম্যানচেস্টারের ব্রেনন। যা হোক, এখন অন্তর্জালের কারণে কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলি নিয়ে প্রথমে, বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গানের একটি বয়ান তৈরি করেছি। অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা আগ্রহী হলে হয়ত আরো কিছু জানা যাবে ভবিষ্যতে।

২

বিদেশে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট আয়োজনের কথা শুনলে প্রথমেই সবার মনে পড়ে রবিশংকর ও জর্জ হ্যারিসনের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে কনসার্টের কথা। কিন্তু, সেটিই প্রথম ও শেষ নয়, বাংলাদেশের জন্য অনেকে গেয়েছেন, কনসার্টও করেছেন যদিও 'বাংলাদেশ কনসার্ট' ছাড়া অন্যগুলি সম্পর্কে তথ্য খুব অপ্রতুল।

এধরনের প্রথম কনসার্টের খবর পাই অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে। ২৯ জুন বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অস্টকেয়ার সিডনির হার্টভিল সিভিক সেন্টারে এক দাতব্য কনসার্টের আয়োজন করেছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন সিলভিয়াবে, রেগ লিন্ডসে, দি পিটারলেন অর্কেস্ট্রা, ব্রায়ান ডেভিস, ইয়ং ওয়ার্ল্ড সিংগারস, ডায়না হিটনব্যালে, স্টিভ ওয়াটসন এবং জেনি ও কিথ হ্যারিস। যে অর্থ পেয়েছিলেন তা শরণার্থীদের জন্য দান করা হয়েছিল।[৪]

সত্তর দশকে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় পপ গায়ক ছিলেন বিলি থর্ন। স্টেজে তাঁর অনেক মন্তব্য নানা জনকে ক্রুদ্ধ করত। কিন্তু সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে থর্ন এমন এক ঘোষণা দিলেন যাতে অনেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ক্ষোভ ক্রোধ উবে গেল। তিনি ঘোষণা করলেন, ক্রিসমাসের সময় টিভিতে তিনি একটি জাতীয় টেলিথন করতে চান। তিনি আশা করেন অস্ট্রেলিয়ার সব পপ গায়ক এবং ব্যান্ড এতে অংশ নেবে। এতে যে টাকা উঠবে তা দান করা হবে বাংলাদেশের শরণার্থীদের। শুধু তাই নয়। ক্রিসমাসে এ কারণে তিনি একটি রেকর্ড বের করতে চান যেখানে সব পপ গায়কের অংশগ্রহণ থাকবে।

সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে তাঁর প্রস্তাব তিনি অস্ট্রেলিয়ার নামী পপ গায়কদের চিঠি মারফত জানালেন। কয়েকদিনের মধ্যে রেডিও স্টেশন এবং কয়েকজন পত্র-পত্রিকা থর্নের প্রস্তাবে সায় দিয়ে উত্তর পাঠালেন।

২৮ সেপ্টেম্বর থর্ন জানালেন, সিডনির ২০টি পপ গ্রুপ তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। থর্নের নিজের শহর মেলবোর্ন থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গেল। তুরাক রোডে রিজেন্ট থিয়েটার সংস্কার করা হয়েছিল। থিয়েটারের মালিক থর্ন-কে জানালেন টেলিথনের জন্য যদি তিনি থিয়েটার চান তাহলে তারা বিনা ভাড়ায় তা দেবেন।

বাংলাদেশের স্বাধীন হয়ে গেল ১৬ ডিসেম্বর। থর্নের টেলিথন হয়েছিল কিনা বা রেকর্ডটি বেরিয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।[৫]

মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য ১৯৭১ সালে লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে ছিল এর শাখা। লিভারপুলে মের্সি সাইডে ছিল এরকম একটি অ্যাকশন কমিটি। এই কমিটির আহবায়ক ছিলেন 'কিসমত' নামে একটি হোটেলের মালিক জনাব সৈয়দ। 'কিসমত'-এ বাঙালিরা জড়ো হতেন। কীভাবে চাঁদা উঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতেন। যুক্তরাজ্যে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছিলেন এমন কয়েকজন বাঙালি ছাত্রও সেখানে আসতেন। এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের মাহবুবুর রহমান খান। 'কিসমত' তার সঙ্গে পরিচয় হয় গায়ক লি ব্রেনানের। তাঁর ছোটখাটো একটি ব্যান্ড ছিল। এর সদস্যরা ছিলেন জন, প্যাটি টমাস, জন ব্রাউন এবং জিমি সেফটন।

ব্রেনান বাঙালিদের কাছে যুদ্ধের বৃত্তান্ত শোনেন। পত্র-পত্রিকায় তো লেখালেখি হচ্ছিলই। তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে চারটি গান লেখেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিদেশিদের মধ্যে তিনি প্রথম যিনি গান লিখেছিলেন। সুরও করেছিলেন তিনি নিজে। ৪৫ তরঙ্গের একটি রেকর্ড প্রকাশ করেন। ক্যাম রেকর্ডস থেকে ১৯৭১ [ক্যাম ৩৬৮] সালে রেকর্ডটি বের হয়। বিষয়গুলি জানার জন্য নাঈমা আমিন অধ্যাপক রহমানের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন—

"১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর আমরা কয়েকজন বাংলাদেশি মিলে মিটিং করছিলাম কিসমত রেস্টুরেন্টে। এরই মধ্যে দীর্ঘ কেশী, মুখে খোঁচা দাড়ি, পিঠে শান্তি নিকেতনের স্টাইলে ঝোলানো ব্যাগ, হাতে একটি গিটার নিয়ে লি ব্রেনন আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। লিভারপুলের বিভিন্ন পাবে

তিনি গান গেয়ে শোনাতেন। বিবিসির প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি নিজ থেকে বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চাইলেন। 'তুমি শিল্পী তোমার অস্ত্র দিয়ে তুমি এগিয়ে আসতে পারো বাংলাদেশের মানুষের সহায়তায়'— এই বলে তাঁকে উৎসাহিত করি আমি। মুচকি হেসে সেদিনের মতো লি ব্রেনন চলে যান। পরের দিন লি ব্রেনন তাঁর নিজস্ব 'জাগুয়ার' গাড়ি নিয়ে আমার বাড়ির সামনে হাজির। বাংলাদেশের জন্য তিনি চারটি গান লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন সেগুলোর, শোনার জন্য সস্ত্রীক আমাদের নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখি, লি ব্রেননের গানের দলের সদস্য ডন, প্যার্টি টমাস, জন ব্রাউন, জিমি সেফটন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এ দলটি চারটি গান গেয়ে শোনাল। গানগুলি এতই শ্রুতিমধুর ও মনোমুগ্ধকর যে, শুনতে শুনতে সেগুলো আমি ফিলিপসের রেকর্ডারে রেকর্ড করে ফেলি। পরের দিন মি. মেফতা ও লি ব্রেনন বিবিসির স্টুডিওতে গিয়ে গানগুলো রেকর্ড করলেন। এরপর রেকর্ড করা এসব গান জমা করা হলো রেস্টুরেন্ট কিসমতে। রেস্টুরেন্টেতো বিক্রি হতোই, লি ব্রেনন যখন যেখানে যেতেন, গানের রেকর্ড সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। কেউ যদি আগ্রহী হয়ে গানের রেকর্ড কিনতে চাইল, তখন তিনি এই গানের রেকর্ড বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে ফান্ডে জমা করতেন। পরে এ ফান্ডের টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য।"[৬]

এখানে তথ্যের অল্প একটু গরমিল আছে। লিভারপুলের ক্যাম স্টুডিওতে গানগুলো রেকর্ড করা হয়েছিল। এবং এর প্রযোজনা করেছিল মের্সি সাইডের বাংলাদেশে অ্যাসোসিয়েশন ইউকে। রেকর্ডের লেবেলের তথ্য তাই বলে। গান চারটির শিরোনাম হলো—

১. ফাইট, ফাইট, ফাইট, ২. উই উইল সারভাইভ, ৩. ফ্রিডম ফাইটার্স এবং ৪. মি. হিউম্যান। মনে হয় ২৩৯ নম্বর গানটি ব্রেনান একাই গেয়েছিলেন। ব্রেনানের খোঁজ পরে করা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায় নি। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি রেকর্ডটি বের করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে লেখা হলেও প্রযোজক হিসেবে লেখা আছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন। নাঈমা ব্রেনানের একটি গানের তিনটি লাইন উদ্ধার করেছেন—

In the name of the humanity
don't allow Bangladesh fight alone
Help them in hour of need.[৭]

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ব্রেনানের একটি রেকর্ড রাখা আছে।

বৃটেনের বিভিন্ন শহরে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে বাংলাদেশের জন্য 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি' শিরোনামে একটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। কামাল আহমদ জানাচ্ছেন সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে বার্মিংহাম, লিভারপুল, স্কানথর্প, লেস্টার, শেফিল্ড, লিডস ও লন্ডনে কনসার্ট হয়েছিল।[৮] তবে লন্ডনের *মর্নিং স্টার* জানাচ্ছে, বার্মিংহাম টাউনহলে **১৭** নভেম্বর, লেস্টার স্কোয়ারে কলোসিয়াম সিনেমা হলে **২১** নভেম্বর এবং লিডস টাউন হলে **২১** নভেম্বর 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি' অনুষ্ঠিত হবে।[৯] অনুমান করে নিচ্ছি, সেপ্টেম্বরে লিভারপুর, স্কানথর্ণ ও শেফিল্ডে কনসার্ট হয়েছিল। নভেম্বরে বাকি শহরগুলিতে। এর বিশেষত্ব ছিল বাংলাদেশ, ভারত ও বৃটেনের শিল্পীরা এতে অংশ নিয়েছিলেন।

'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি'র উদ্যোগ নিয়েছিলেন রবিশঙ্করের ভাইপো বীরেন্দ্র শঙ্কর। এ পরিবারের রবিশঙ্কর ও আলী আকবর খাঁ-ও [রবিশঙ্করের প্রথম স্ত্রীর ভাই] এগিয়ে এসেছিলেন বাঙালিদের জন্য। বীরেন্দ্রশঙ্করের এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি। বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন আপেল মাহমুদ, মোশাদ আলী ও শাহ আলী সরকার। ভারতের আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার ও তার কর্ণধার রুমা গুহঠাকুরতা, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ।[১০]

অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ, লন্ডনের রয়েল অপেরা হাউসের কনডাক্টার কলিন ডেভিস ও জ্যাজ গায়ক ক্লিও লেইন ঘোষণা করেন, 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি' অনুষ্ঠিত হবে চারটি জায়গায় [উল্লিখিত] সবাই যেন তাতে যোগ দেন। তাঁরা আরো জানান, ১৪ নভেম্বর লন্ডনের স্যাডলার ওয়েলস থিয়েটারে প্রথম কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে। ৩.৩০ মিনিটে শুরু হবে প্রথম পর্ব। তাতে থাকবেন আপেল মাহমুদ, মোশাদ আলী, রুমা গুহঠাকুরতা, ব্রিটিশ চেল্লোবাদক কীর্থ হর্থের্ভ, জন টেইলর এবং জ্যজে গায়ক নর্ম উইনস্টোন।[১১] সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দ্বিতীয় শো।

তবে, খবর হচ্ছে, এই কনসার্টে কবিতা পাঠ করেছিলেন গ্লেন্ডা জ্যাকসন, স্যাডলার ওয়েলস থিয়েটারের কনসার্টে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। গ্লেন্ডা জ্যাকসন তখন বিখ্যাত অভিনেত্রী। বিশ্বজোড়া তাঁর নাম। **১৯৯২** থেকে **২০১৫** পর্যন্ত উত্তর লন্ডনের হ্যাম্পস্টেইড এলাকার এম. পি। তিনি অবসর নিলে সেই এলাকা থেকে নির্বাচিত হন শেখ রেহানার কন্যা টিউলিপ সিদ্দিকী। *বাংলাদেশ নিউজলেটার*— এর ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি সেখানে একটি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করেন। পাঠ করেন শেকসপিয়র ও ইয়েটস থেকে।[১২]

কামাল আহমেদ গ্লেন্ডার একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, গ্লেন্ডা সে অনুষ্ঠানের কথা মনে করতে পারেন নি। লিখেছেন তিনি, "এখানে বরং ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে তাঁর একাত্তরের উচ্চারণের কিছুটা স্মরণ করাই ভালো:

বাংলার মাটির চেয়ে ভালো ব্লাড ব্যাংক আর নেই। যেখানে প্রতি ফোঁটা রক্ত দশ ফোঁটা হয়ে যায় তাই মানুষ আর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে যায় না। বাংলার অফুরান রক্ত মাটি শুষে নেয়।"[১৩]

এ প্রসঙ্গে 'গুডবাই সামার'-এর উল্লেখ করতে হয়। **১৯৭১** সালের **১৮** সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওভাল ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামে কনসার্টটি হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিল *কস্তর* নামের একটি দাতব্য সংগঠন। কনসার্টে যোগ দিয়েছিল সে সময়ের পরিচিত ব্যান্ড দল— *মট দা হুপল*, *লিভিসফার্ণ*, *কুইনটেসেন্সে*, *অ্যাটমিক রুস্টার*, *ইউজিন ওয়ালেস*, *দা গ্রিস ব্যান্ড*, *কোচিস*, *দা হু এবং দা ফেসেস।*

দেড় পাউন্ড ছিল টিকেটের দাম। কনসার্ট থেকে আয় হয়েছিল **১৮,৩৩৬** পাউন্ড। হু তার প্রাপ্য থেকে ২৫ ভাগ দান করে দিয়েছিল বাংলাদেশের জন্য। সারে ক্রিটেক ক্লাবকে দেয়া হয়েছিল ৩০০০ পাউন্ড। শরণার্থীদের জন্য খুব সম্ভব **১৫**,০০০ পাউন্ড দান করা হয়েছিল। বেলা **১১** টায় শুরু হয়ে রাত প্রায় **১১**টা পর্যন্ত চলেছিল কনসার্ট। প্রায় ৩৫,০০০ দর্শক হয়েছিল। সে হিসাবে ঠিক হলে প্রায় ৫২,৫০০ পাউন্ড আয় হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের ব্যান্ড দল কোচিস। কান্ট্রি রক ব্যান্ড এর প্রধান গায়ক ছিলেন স্টুয়াট ব্রাউন। এলটন জনের সঙ্গে পরে তিনি ব্লুসোল নামে একটি দলও গড়েছিলেন। *দা গ্রিসব্যান্ড* ব্রিটিশ রক ব্যান্ড। কোচিস এর পর তারা মঞ্চে পরিবেশনা করেছিল। ব্রিটিশ আরেকটি রক ব্যান্ড *অ্যাটমিক রুষ্টার*। তাদের সেই সময় আমেরিকা সফর করার কথা। কিন্তু, বাংলাদেশের জন্য কনসার্টের আমন্ত্রণ পেয়ে তারা মার্কিন সফর বাতিল করে। **১৯৭১** সালে তাদের পরিবেশিত দু'টি গান 'টুমরো নাইট' ও 'ডেভিল'স আনসার' ইংল্যান্ডের বেস্ট সেলিং রেকর্ড তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

কুইন্টিসেন্স ছিল ভিন্নধর্মী ব্যান্ড। ভারতীয়, জ্যাজ, রক সব মিলিয়ে ছিল দলটি। এর বিদম গিটারিষ্ট ছিলেন মহাদেব, বেস গিটারিষ্ট শম্ভু বাবাজি, লিড গিটারিষ্ট অ্যালন মষ্টার্ট, পার্কসনিষ্ট ও ভোকাল শিবশঙ্কর জোনস, ড্রামার জ্যাক মিল্টন ও বাঁশী রাজা রাম। ৪৫ মিনিট ধরে তারা পরিবেশন করেছিলেন। ঐ সময় জনপ্রিয় ব্যান্ড দল হিসেবে পরিচিত ছিল কুইন্টিসেন্স।

বিকেলে গান পরিবেশন করেছিল আরেকটি ব্রিটিশ দল *মট দা হুপল*। ঐ সময় 'অল দা ইয়াং ডিউডস' গানটি তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

লিন্ডিসফার্ন গড়ে উঠেছিল অ্যালান হাল, রে জ্যাকসন, সিমোন কাউই, রে ক্রেসেন্টকে নিয়ে। তিন বছরের মধ্যে প্রকাশিত দুটি অ্যালবাম 'ফগ অন দা টাইন' ও 'নাইসলি আউট অব টিউন' খ্যাতিমান করে তুলেছিল। এ দলের গায়ক ছিলেন অ্যালান হাল।

এদের মধ্যে খানিকটা অপরিচিত আইরিশ গায়ক উইজিন ওয়ালেস। তবে, কনসার্টের আকর্ষণ *দা হু* এবং *দা ফেসেস*।

১৯৬৯ সালে গায়ক রড ষ্টুয়ার্টের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে *দা ফেসেস*। রড ষ্টুয়ার্ট তখন তুমুল জনপ্রিয়। এই দলের কী বোর্ডে ছিলেন আয়ন ম্যাকলাগান, বেস গিটারিস্ট ও ভোকাল রনি লেন। ড্রামার কেনি জোনস, গিটারিস্ট রনি উড। তবে চিনতেন সবাই রড স্টুয়ার্টকে [পরবর্তীকালে স্যার][১৪]

সবশেষে মঞ্চে এসেছিল *দি ফেসেস*। দর্শকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। রড স্টুয়ার্ট একটি চিতাবাঘের চামড়ার স্যুট পড়েছিলেন। পরে এটি নিলামে তুলেছিলেন। ৫০০ পাউন্ডে তা বিক্রি হয়েছিল। মতিউর রহমান নিয়াজ আলমের এক সাক্ষাৎকার থেকে উদ্বৃত করেছেন, "সেদিন রড ভিড়ের মধ্যে ৫০০ ফুটবলে লাথি মেরেছিলেন, যেটি দর্শকদের অনেকক্ষণ ধরে মাতিয়ে রেখেছিল। রড স্টুয়ার্ট বলেন, "তারা ছিলেন আমাদের লোক।... লন্ডনে নানান জাতির লোকজন এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় ১০ হাজার সোমালীয় এসেছে। সুতরাং সেখানে আসলে ছিলেন আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই। বাংলাদেশিরা কাজ পাগল। কঠোর পরিশ্রম করতে পারে তারা। এ কারণে আমরা তাদের শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম। আমরা মূলতঃ তাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। এ পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।"[১৫]

হু গড়ে উঠেছিল লন্ডনে, ১৯৬৪ সালে। এদের ভোকাল বা গায়ক ছিলেন দু' জন রজার ডাল্ট্রে ও পিট টাউনশেন্ড। বেস গিটারিস্ট জন এটউইসল ও ড্রামে ছিলেন কিথ মুন। হু সেদিন মাতিয়ে দিয়েছিল নতুন সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে। এই সাউন্ড সিস্টেমের কারণে অনেকে বিপাকে পড়েছিলেন। খুব আগ্রাসী ভঙ্গিতে তারা পরিবেশন করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাদের অধিকাংশ গান ছিল নতুন। 'সামারটাইম লুজ' দিয়ে তারা শুরু করেছিলেন, 'জেনারেশন' গাওয়ার সময় টাউন্ডশেন্ড গিটার ভেঙ্গে ফেলেন।

সঙ্গীত সমালোচক ক্রিস চার্লসঅর্থ হু কে কনসার্টের বিজয় মুকুট দিয়েছিলেন। লিখেছেন তিনি— Not that the Faces played badly, the warmed up into one of their Spontenous chunks of excitement comfortably- but the who played and sounded better. Comparisons with groups like the who are unfair, but the sight of the audience cheering and waving their arms when the who's gigantic arc light were switched on is a sight I shall remember for many a year."[১৬]

মতিউর রহমান আরো কিছু ব্লগ ও সঙ্গীত রসিকদের বক্তব্যের সারমর্ম করেছেন এভাবে "সৌভাগ্যক্রমে পুরো সন্ধ্যাটা আক্ষরিকভাবেই পাল্টে দিয়েছিল ব্যান্ড দল হু এবং দা ফেসেস। আগত দর্শকদের রঙিন, বর্ণাঢ্য এই পোশাকের মতোই গুডবাই সামার কানসার্টটিও হু এবং ফেসেসের কারণে হয়ে উঠেছিল তুমুল কোলাহলপূর্ণ উন্মাদনাময় ও বর্ণাঢ্য। রাতে যখন বিস্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল রংধনুর মতো আলো, দর্শকেরা চিৎকার করে, দুহাত নাড়িয়ে উল্লাস করছিলেন।

বাংলাদেশের এক চরম দুঃসময়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ্বনন্দিত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি বা গায়কেরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন হৃদয় দিয়ে। তাঁরা গলা খুলে চিৎকার করে গান করেছেন বাংলাদেশের পক্ষে। সে চিৎকারে এগিয়ে এসেছেন বিদেশিরা। বাংলাদেশকে নিয়ে বাঁধা তাঁদের সুর পৌঁছেছে বিশ্ববাসীর কাছে।"[১৭]

এক খবরে জানা যায় মোট টিকেট বিক্রি হয়েছিল ৩৯,৩৭৫ পাউন্ড। ওভাল ভাড়া ৬,০০০ পাউন্ড, কনসার্ট চালানোর খরচ ১৮,০০০ পাউন্ড। লাভ ১৫,২০০ পাউন্ড যা দান করা হয়েছিল বাঙালি শরণার্থীদের জন্য।[১৮]

৩

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকে জোন বায়েজ আমাদের প্রিয়। তখন তো গানের রেকর্ড তেমন পাওয়া যেত না। বিদেশিদের বিক্রি করে দেওয়া রেকর্ড যা পাওয়া যেত গুলশান এক নম্বর মার্কেট ও এলিফ্যান্ট রোডের কিছু দোকানে। নতুন কিছু রেকর্ডও আসত। রেডিয়োতে শোনা যেত।

১৯৭১ সালে একদিন গভীর রাতে বিবিসি কী রেডিও অষ্ট্রেলিয়া শুনছি। হঠাৎ শুনি, নোয়াখালি থেকে একজন শ্রোতা অনুরোধ জানিয়েছেন জোন বায়েজের 'উই শ্যাল ওভারকাম' গানটি বাজাবার জন্য। নিস্তব্ধ রাত, অন্ধকার, মাঝে মাঝে গুলির শব্দ, জোন বায়েজের গলা ভেসে এল 'উই

শ্যাল ওভারকাম সাম ডে'। এ অনন্য এক অভিজ্ঞতা। গান শেষ হলে মনো হলো, কে আমাদের হারাবে? জোন বায়েজ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ওপর বিখ্যাত গানটি লিখেছিলেন, গেয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবাদী স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলে নিই, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম কনসার্টের আয়োজন করেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। ১৯৭১ সালের ২৮ শে মে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রানসিসকোতে বার্কালে ক্যাম্পাসে বাংলাদেশের জন্য একটি কনসার্ট করেন।[১৯] হয়ত, পিতার জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কথা তাঁর মনে পড়ছিল।

মানবাধিকার রক্ষার গায়িকা হিসেবে তখন জোন বায়েজের নাম বিশ্বজোড়া। মিসেস রানু বসুর কাছে মনে হয়েছিল, বাঙালিদের মানবাধিকার রক্ষায় জোন বায়েজ নিশ্চয় এগিয়ে আসবেন। তিনি স্টানফোর্ডের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অনুরোধে অ্যাসোসিয়েশন থেকে জোন বায়েজের সঙ্গে যোগাযোগ করে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জোন বেজের একক কনসার্ট করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। জোন তাতে সাড়া দেন। ২৪ জুলাই ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় জোন বায়েজের একক কনসার্টের। এতে সহায়তা করে আমেরিকান লিগ ফর বাংলাদেশ, দি পিপলস ইউনিয়ন ও ইন্সটিটিউট ফর দা স্টাডি অব নন ভায়োলেন্স। সান্‌ফ্রানসিসকো শহরের প্রায় ১২,০০০ শ্রোতা কনসার্ট শুনতে এসেছিলেন।[২০] কনসার্টে জোন বায়েজ যে গানগুলি আগে গেয়েছেন তাই গেয়ে শোনান।

কনসার্ট চলাকালীন আমেরিকান লিগ ফর বাংলাদেশ এবং ষ্ট্যানফোর্ড ইন্ডিয়া ষ্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ৮,০০০ লিফলেট বিলি করে। লিফলেটে উল্লেখ করা হয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র জড়িত। নিকসন প্রশাসনের অনৈতিক ও লজ্জাজনক বাংলাদেশ নীতির সমালোচনা করে জোন বায়েজ শ্রোতাদের অনুরোধ জানান একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করার। স্মারকলিপিতে পাকিস্তানকে সহায়তা না করার দাবি জানানো হয়েছিল। কয়েক হাজার শ্রোতা তাতে স্বাক্ষর করেন।[২১]

সান ফ্রানসিসকোর এই কনসার্টের পর ২৪ অক্টোবর মিশিগান অ্যান আরবরের ক্রাইসলার এরেনাতে জোন বায়েজ আরেকটি কনসার্ট করেন। এতে প্রায় ২০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বায়েজ গানের ফাঁকে ফাঁকে আবারও নিকসন প্রশাসনের নীতির নিন্দা করেন এবং সবাইর কাছে আবেদন জানান শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য। সবশেষে বাংলাদেশ-কে নিয়ে লেখা ও সুর দেওয়া সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে শোনান—

When the sun sinks in the west
Die a million people of Bangladesh.[২২]

জোন বায়েজের আত্মজীবনীতে বাংলাদেশের জন্য তাঁর কনসার্ট ও এই গানটির কোনো উল্লেখ নেই। তবে, পশ্চিম জার্মানীর শিল্পী জুলিয়া ওয়েডিং এই গানটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে গেয়েছিলেন এবং রেকর্ডটি প্রকাশিতও হয়েছিল।

৪

'আমার বন্ধু এল দেখা করতে, বিষণ্ন চোখ তার, দেশ তার অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার আগে চায় সে কিছু করতে'— বিটলস খ্যাত জর্জ হ্যারিসন এভাবেই শুরু করেছেন তাঁর বিখ্যাত গান 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। আসলে ব্যাপারটা ছিল এরকম। লিখেছেন হ্যারিসন, '১৯৭১ হবে নিশ্চয়, লস এঞ্জেলসে 'রাগ'-এর রেকর্ডিং করছি। রবি আমাকে বলছিল যে, সে একটি কনসার্ট করতে চায়। যে ধরনের কনসার্ট সে করে তার থেকে বড় খাতে হাজার ২৫ ডলার ওঠে। সে টাকা দেয়া যাবে ক্ষুধার্ত বাঙালিদের [শরণার্থী]। সে জিজ্ঞেস করল, আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা, যেমন, কনসার্টটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া বা পিটার সেলার্সকে কনসার্টে নিয়ে আসা..."

রবি অর্থাৎ রবিশঙ্কর তারপর জর্জকে পত্রপত্রিকার কাটিং দেখালেন বাংলাদেশ সম্পর্কে। জর্জের মনে হলো রবিকে সাহায্য করা দরকার।

রবিশঙ্কর লিখেছেন, "বাংলায় আমার জন্ম। বাংলাদেশের বাঙালিদের অবস্থা আমাকে বিচলিত করবে সেটিই স্বাভাবিক। আমি শরণার্থী ও হাজার হাজার শিশুর জন্য কিছু করতে চাইছিলাম। জর্জ হ্যারিসনকে আমার উদ্বেগের কথা জানালাম। সে আমার মনের অবস্থা জানত।"[২৩] এ ভাবেই তখন পর্যন্ত দাতব্যের জন্য পৃথিবীর প্রথম কনসার্টের আয়োজন শুরু হলো। নাম দেয়া হলো 'দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

বিটলসের হঠাৎ খেয়াল জেগেছিল তারা রবিঙ্করের কাছে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত শিখবে। এই খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্করও বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি তখন বিটলসের। আমরা তা দেখেছি। আজকের প্রজন্ম বুঝতেই পারবে না সে খ্যাতির মাত্রা কেমন ছিল।

রবিশঙ্কর বলেছেন "৬৬ সাল থেকে শুরু হলো আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। দুম করে হঠাৎ সুপারস্টারডম পেয়ে গেলাম। সারা দুনিয়ার

যুব সমাজের কাছে একটা, গুরু বনে গেলাম রাতারাতি। এবং সেটা ঘটে গেল যেহেতু অন্যতম বীটল জর্জ হ্যারিসন আমার শিষ্য হয়ে বসল।" জর্জ সম্পর্কে বলেছেন, "এখন সে অনেক পরিণত মনের ছেলে। ও আমাকে ভীষণই শ্রদ্ধা করে। ছেলেটিতো অত্যন্ত ভালো। চমৎকার মন এবং ওর প্রতি আমার অসীম স্নেহ। তবে গান বাজনার ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার একবারেই কোনও যোগাযোগ নেই।"[২৪]

পুরো আয়োজনটা জর্জকেই করতে হয়েছিল। কারণ, জর্জকে সবাই চেনে, তাঁর অনুরোধ ফেলা মুশকিল। তা ছাড়া জর্জ যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন তারাও সবাই নাম করা। এক সঙ্গে গান করার অভ্যাস তাদের নেই। দাতব্যের ধারে কাছে তারা ছিলেন না। জর্জ লিখেছেন, তিন মাস ধরে তিনি ফোনে ফোনে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন বিটলস, তার সঙ্গী রিঙ্গোষ্টার, বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপ্টেন, বিলি প্রেসটনের সঙ্গে। সবাই রাজি হয়েছেন। অনেক বায়নাক্কা ছিল শিল্পীদের। ক্ল্যাপটন যেমন বলেছিলেন, তাকে ড্রাগ সাপ্লাই দিতে হবে। জর্জ তাতেই রাজি হয়েছিলেন।

কবে হবে কনসার্ট? জর্জ জানিয়েছেন এক ভারতীয় জ্যোতিষী তাঁকে বলেছিলেন, আগস্ট মাসটা ভালো। ১ আগস্ট তারিখ ঠিক হলো। দু'টি সেশন হবে। অপরাহ্নে একটা, সন্ধ্যায় আরেকটা। স্থান, নিউ ইউর্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার। পোস্টারে লেখা ছিল জর্জ হ্যারিসন এন্ড ফ্রেন্ডস। টু পারফরম্যানসেস। সানডে ফার্স্ট আগস্ট। 2.30 PM 8 PM. "No refunds on exchanges. Limit 4 tickets per person."[২৫]

যাদের নিয়ে কনসার্ট হয়েছিল তাঁরা হলেন, এরিক ক্ল্যাপটন, বব ডিলান, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রেসটন, লিওন রাসেল, রিঙ্গোষ্টার, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ওস্তাদ আল্লারাখা, কমলা চক্রবর্তী। আরো ছিলেন জেসি এড ডেভিস, টম ইভান্স, পিটি হ্যাস, মাইক গিবিনস, জিম কেল্টনার, জয়ি মোল্লান্ড, ডন প্রেসটন, কার্ল র‍্যাডল, ক্লাউস ভূরম্যান, হলিউড হর্নস, ব্যাড ফিঙ্গার।

দু'পর্বে ভাগ করা হয়েছিল কনসার্টটি। প্রথম পর্বে সিতার বাজিয়েছিলেন রবি শঙ্কর আর সরোদ আলী আকবর খান। আল্লারাখা তবলায়। রবিশঙ্কর 'বাংলাদেশ ধুন' নামে নতুন একটি রাগ তৈরি করেছিলেন। রবিশঙ্কর দু'টি গান কম্পোজ করেছিলেন— 'একটি জয়বাংলা জয়বাংলা।' অন্যটি 'ও ভগবান ও খোদাতালা। দুটি 'গানই পরে রেকর্ড করা হয়েছিল।[২৬]

কথাছিল এক সপ্তাহ রিহার্সল হবে। কিন্তু জর্জ জানিয়েছেন, পুরো রিহার্সেল কখনও হয়নি। টুকরো টুকরো রিহার্সেল হয়েছে। নির্দিষ্ট দিন ক্ল্যাপ্টন পৌঁছলেন নিউ ইউর্ক। হোটেলে পৌঁছে দেখেন ড্রাগ ঠিকঠাক মতোই রাখা আছে। কিন্তু, দেখা গেল সেই ড্রাগে কিছুই হচ্ছে না। ফলে, হোটেল থেকে তিনি বেরুতে পারছেন না। শেষ মুহূর্তে বিটলসদের ম্যানেজার এলেন ক্লেইন সব শুনে বললেন, আলসারের জন্য তিনি যে অষুধ খাচ্ছেন, ক্ল্যাপটন সেটি খেয়ে দেখতে পারেন। আশ্চর্য! সেই অষুধ খেয়ে ক্ল্যাফটন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। যোগ দিলেন কনসার্টে। লিখেছেন, আই ফেল্ট অ্যাশেমড।[২৭]

রবিশঙ্কর লিখেছেন "টানা দু' সপ্তাহ কনসার্টের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। ঐ আমলের প্রথিতযশা অনেকে একসঙ্গে পারফর্ম করতে রাজি হয়েছিলেন যা সাধারণত তারা করেন না এবং কোনো পয়সা ছাড়া, সেটা ছিল অভূতপূর্ব। তিনি আরো লিখেছেন, "কি বিশাল সাফল্য! প্রতিদিন টানা দু দুটো শো হতো আমাদের একটি ম্যাটিনি, অন্যটি সন্ধ্যাবেলায়। প্রতিটি শোতেই হাজার বিশেকেরও বেশি দর্শকের সমাগম হতো। কনসার্টের ওপর তৈরি ছবি, ডিস্ক ও ক্যাসেট বিক্রির বদলে সন্তোষজনক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হলো। টাকা কড়ি লেনদেনে সরাসরি আমাদের কোনো হাত ছিল না। খরচাপাতি বাদ দিয়ে পুরো টাকাটাই ইউনিসেফ পরিচালিত বাংলাদেশি শরণার্থীদের সাহায্য তহবিলে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশ নামটি রাতারাতি সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠলো। আর জর্জ হ্যারিসনের সেই গান 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ তো তক্ষুনি হিট।"[২৮]

বাংলাদেশ কনসার্ট সম্পর্কে রিঙ্গোক্টার মন্তব্য করে ছিলেন— "The Beauty of the event came across and the audience was so great."

এরিক ক্ল্যাপটনের মন্তব্য— "This will always be remembered as a time that we could be proud of being musicians. We just weren't thinking of ourselves for five minutes."

জর্জ হ্যারিসন লিখেছেন— "মিউজিশিয়ানরা তাদের অহমিকা ভুলে একত্রে কাজ করেছিলেন। পুরো কনসার্টের ভাবটা ছিল এটি আমাদের অনেকের চেয়ে বড় ব্যাপার। শুধু তাই নয়, অনেক তরুণ ও সাধারণ মানুষ এতে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেরা টাকা তুলে ইউনিসেফের তহবিলে দান করেছিল।"[২৯]

হ্যারিসন তার পর্ব শেষ করেছিলেন বাংলাদেশ দিয়ে—

"My Friend came to me, with sadness in this eyes. Told me that he wanted help before his country dier."

এই কনসার্ট থেকে ২,৪৩,৪১৮.৫০ ডলার ইউনিসেফকে দান করা হয়েছিল। এর আগে এ ধরনের কোনো কনসার্ট হয়নি এবং এতো টাকাও ওঠানো হয় নি।

অনেক লেখালেখি, সংবাদ এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত যতটুকু সাড়া জাগিয়েছিল, বায়ে হ্যারিসন ও বায়েজের বাংলাদেশ নিয়ে গান ও গিনসবার্গের কবিতা তার চেয়ে কম সাড়া জাগায়নি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এতে প্রবলভাবে সাড়া দিয়েছিল। আজকে আমরা যে ব্রান্ডিং এর কথা বলি এ তিনজন সেই ব্রান্ডিং করে দিয়েছিলেন।

রবিশঙ্কর তারপরও বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছিলেন। একটি সংবাদে জানা যায় আইওয়া শহরের 'আইওয়া বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' ২১ অক্টোবর শরণার্থীদের সাহাযার্থে রবিশঙ্করের একটি একক বাদন সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল এবং এর জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল।[৩০]

১৭ই সেপ্টেম্বর টরেন্টোতে বাঙালিদের সাহায্যের জন্য এক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইটন্‌স অডিটোরিয়ামে। গান গেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পী সুমন কল্যাণপুর। যে টাকা আয় হয়েছিল তা দেওয়া হয়েছিল অক্সফামে।[৩১]

৫

বিদেশে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তার জন্য মাঝে মাঝে কনসার্ট হয়েছে। ব্রেনান, হ্যারিসন ও জোন বায়েজই শুধু গান লিখেছেন বাংলাদেশের জন্য। তারা গণমাধ্যমে বাংলাদেশের গণহত্যার ও শরণার্থীদের খবর দেখে দুঃখ পেয়েছেন, সমব্যাথী হয়েছেন। বলা যেতে পারে এর আরেকটি কারণ খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ। চার্চে মানবতার কথাটিই বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় শিশুকাল থেকে। এ কথা বললে আজ অনেকে নারাজ হবেন কিন্তু কথাটা সত্যি যে, ১৯৭১ সালে ইউরোপ আমেরিকার সাধারণ মানুষ যারা খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী তারা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল বাঙালিদের জন্য সে রকমভাবে মুসলমানরা এগিয়ে আসেনি। সেভাবে বলবো কেনো, তারা মুসলমান কর্তৃক মুসলমান হত্যায় বরং প্রণোদনা যুগিয়েছে।

ভারতের কথা যদি ধরি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিরা পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের দুর্দশায় আপ্লুত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সাল ১৯৪৭ এর পর প্রথমবার বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দেয়। ত্রিপুরা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সৃজনশীলতার নতুন দুয়ার খুলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ নিয়ে এমন কোনো দিন নেই যেদিন সংবাদ-সাময়িকপত্রে কিছু লেখা হয়নি। সংবাদ ছাড়াও গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রচুর লেখা হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির নাম দিয়েছি 'একাত্তরের সাহিত্য'। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধ শেষে আর লেখা হয় নি বাংলাদেশ নিয়ে, সে আবেগও অন্তর্হিত। এর সমাজতাত্ত্বিক কারণ জানি না। কিন্তু আবেগ কেমন ছিল তার একটি উদাহরণ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শিরোনামহীন এক টুকরো গদ্য "একদিন নিরুপায় চেকপোস্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। খাবার উপায় নেই। ও দেশে খাইও নি কোনও দিন। আবাল্য স্বপ্ন দেখে এসেছি। মিথ্যে করে জনে জনে বলেছি, আসলে দু' পুরুষ আগে ওদিক পানেই আমাদের ঘরবাড়ি ছিল।

ছিল কেন? আজও আছে। রহিম বা রহমানের ঘর কি আমার নয়? তার ভাষার আকাশ কি আমার ভাষার আকাশ নয়?

ওদের অনেককেই কথা দিয়েছিলাম, সুযোগ পেলেই তোমাদের কাছে যাব। সে কথা রাখতে পারিনি। আজ যাই না কেন? কলম ছুড়ে ফেলে কুড়াল কাঁধে নিই। চলি। আজ সত্যিই বাধ্যনিষেধ ভেঙে।

ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দিন এসেছে।"[৩২]... বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা—

"বিষন্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিখরে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিনহাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।"...[৩৩]

এই সাহিত্যের একটি অংশ ছিল গান। এক, পুরনো গান নতুনভাবে ফিরে এসেছে, নতুন অর্থ নিয়ে। দুই, নতুন নতুন গানও রচিত হয়েছে, সুর দেওয়া হয়েছে, গাওয়া হয়েছে, রেকর্ড বেরিয়েছে। যেমন, গোবিন্দ হালদার নতুনভাবে গীতিকার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের গান নিয়ে আলোচনা দু'ভাবে করা যেতে পারে— এক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান, দুই, বাঙালি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গায়ক-গায়িকাদের গাওয়া গান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অভাবের কারণে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ ধরা যেতে পারে।

১৯৬৯ সাল থেকেই বাংলাদেশে উদ্দীপনামূলক গানের বিস্তার শুরু। বলা যেতে পারে জহির রায়হানের জীবন থেকে নেয়া-র মাধ্যমেই এধারার শুরু। ১৯৭১ সালে তা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। জয় বাংলা শ্লোগান উচ্চারিত হতে থাকলে এই শ্লোগানটি গানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এ সর্ম্পকিত প্রথম গানের শুরু, আশ্চর্য হলেও সত্যি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে এই গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

'জয়বাংলা' গান প্রথম রেকর্ড করা হয়েছিল ইসলামাবাদে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে। সেখানে পাকিস্তান ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের পরিচালক সৈয়দ জিল্লুর রহমান ও আহাদ চৌধুরী এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা ও গায়ক আসাদুল হকের সঙ্গে দেখা হলে, জিল্লুর রহমান প্রস্তাব করলেন, আওয়ামী লীগের ভূমিধ্বস বিজয় উপলক্ষ্যে একটি গানের রেকর্ডিং করা হবে। গীতিকার নঈম গওহর ও সুরকার আজাদ রহমান। ইসলামাবাদে ছিলেন তখন ফিরোজা বেগম ও সাবিনা ইয়াসমীন। আসাদুল হকসহ তাঁরা গানটি গাইবেন। স্থানীয় শিল্পী যাঁদের পাওয়া যাবে তাঁদেরও যুক্ত করা হবে। প্রথমে বেতার ষ্টুডিওতে গান রেকর্ডিং হলেও পাঞ্জাবি শিল্পীরা আপত্তি জানিয়ে বললেন, এইচএমভি যেহেতু এই গানের রেকর্ড বের করবে, সেহেতু সেখানেই তা রেকর্ড করা উচিত। পরে এইচএমভি ষ্টুডিওতে গান রেকর্ড করা হলো। গান গেয়েছিলেন সম্মিলিতভাবে ফিরোজা বেগম, সাবিনা ইয়াসমীন, আসাদুল হক, নাসির হায়দার, জিনাত রেহানা, রুখসানা রহমান, কাজী আহসানুল হক, লায়লা সামাদ ও আসাদুল্লাহ সিদ্দিকী। পাকিস্তান এইচএমভির জেনারেল ম্যানেজার রাশেদ লতিফ ও তাঁর স্ত্রী রোজি লতিফের কারণেই এইচএমভি থেকে রেকর্ডটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। (ই, কে, ডি নং ২০০৬ ডিসেম্বর ১৯৭০) রেকর্ডের এক পিঠে বঙ্গবন্ধুর ছবি, উল্টো পিঠে শিল্পীদের ছবি।

প্রথম পিঠ

পূর্বের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময় জয় জয় জয়, জয় জয় জয়, জয় জয় জয়, জয় বাংলা।

দ্বিতীয় পিঠ

জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো
অমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো।
রেকর্ডিংটি ডিসেম্বরেই বাজারে ছাড়া হয়েছিল।[৩৪]

মুক্তিযুদ্ধে গানে গানে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা সৃষ্টি করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আলোচনা বেতার কেন্দ্র দিয়েই শুরু করি।

৬

মুক্তিযুদ্ধে আমরা ১১টি সেক্টরের কথা বলি। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটি সেক্টর ছিল, যাকে বলা যেতে পারে ১২ নম্বর সেক্টর— স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিবিসি যে ভূমিকা রেখেছিল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও ১৯৭১ সালে সে ভূমিকা রেখেছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারের গানগুলো শোনার জন্য কী আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতাম! এসব গান বারবার মনে করিয়ে দিত, বেঁচে থাকতে হবে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গান। কেন্দ্র নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এখানে আমি আর তার বয়ান দেব না এবং এ বিবরণে তা প্রাসঙ্গিকও নয় তেমন। তবু বলব, এর ভূমিকা বাদ দিয়ে কোনো রচনা সম্পূর্ণ হবে না।

উনিশ শতকের শেষার্ধ বা বলা চলে বিশ শতকের গোড়া থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত রচিত গানই প্রচারিত হতো কেন্দ্র থেকে। সাদামাটা ভাষায় বলা যায় দেশাত্মবোধক, গণজাগরণমূলক সেইসব গান। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, ছিলেন নজরুল, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে সেই সময়ের গোবিন্দ হালদার পর্যন্ত। সেইসব গান বঙ্গভঙ্গের সময়, চল্লিশের দশকে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সময় মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই একইভাবে বাঙালিকে প্রণোদনা জুগিয়েছিল এবং তা সামগ্রিকভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের গান হিসেবে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এসব পুরোনো গানের পাশাপাশি গীতিকারেরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গীতিকারেরা লিখলেন নতুন নতুন গান। গাইলেন বিখ্যাত সব শিল্পী। সেইসব গান নিয়মিত প্রচারিত হতে লাগল কেন্দ্র থেকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের গানগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনা করব প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা কী করেছিলেন তা নিয়ে।

কেন্দ্র থেকে মূলত চার ধরনের গান প্রচারিত হয়েছে— উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রচিত গান, যাকে বলা হতো স্বদেশি সংগীত। এ গানগুলোর অধিকাংশ-এর রচয়িতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন প্রমুখ। যেমন :

১. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৫]
২. কারার ঐ লৌহ-কপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট— নজরুল ইসলাম।
৩. একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি— অজ্ঞাত
৪. ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৫. মোদের গরব মোদের আশা— অতুলপ্রসাদ সেন
৬. মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়— রজনীকান্ত সেন
৭. ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে— মুকুন্দ দাস
৮. মানুষ হ' মানুষ হ' আবার তোরা মানুষ— গুরুসদয় দত্ত।
৯. মুক্তির মন্দির সোপান তলে— মোহিনী সেন

১৯৪০-এর দিকে গাওয়া আইপিটিএ বা গণনাট্য সংস্থার গাওয়া গানগুলো যার মধ্যে সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত গানগুলোই বেশি প্রচার করা হতো।

যেমন :

১. মানব না এই বন্ধনে— সলিল চৌধুরী
২. শোনো দেশের ভাই ভগিনী— হেমাঙ্গ বিশ্বাস
৩. বিচারপতি তোমার বিচার— সলিল চৌধুরী
৪. গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা— ভূপেন হাজারিকা

গত শতকের শুরু থেকেই এ গানগুলোর (ক্রম ১-৯) সঙ্গে বাঙালি পরিচিত। স্বদেশি গান যাঁরা লিখেছিলেন ও সুর করেছিলেন, তাঁরা দুটি বিষয়ে খেয়াল রেখেছিলেন। গানের বাণী ও গানের সুর। গানের কথায় যেন দেশের কথা, দেশকে ভালোবাসার কথা মূর্ত হয়। আবেগের সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকে যে স্বদেশি গানের শুরু হয়েছিল, তাতে মার্গ সংগীতের প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুল প্রসাদ— সবাই বাউল, ভাটিয়ালি, সারি গানের সুরে জোর দিয়েছিলেন। যে কারণে স্বদেশি গান নিম্নবর্গের মানুষের কাছেও আদৃত হয়েছিল এবং কালে তা ধ্রুপদি সংগীতে পরিণত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছিলেন। লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়, "যে সমস্ত গানকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর মর্মবাণী সেদিন ভাষা পাইয়াছিল, সে সব গান প্রায় সমস্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং এই সময়কার রচনা।"[৩৬]

১৯৭১ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা গানই কেন্দ্র থেকে বেশি প্রচারিত হয়েছে। বিশ শতকের গত শতকের ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের যে লড়াই, তা প্রতিফলিত হয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথের যেসব গান প্রচারিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা যেতে পারে:

১. আমার সোনার বাংলা
২. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৩. আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
৪. ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
৫. বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও
৬. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৭. বাংলার মাটি বাংলার জল
৮. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৯. আমি ভয় করব না ভয় করব না
১০. বাংলার মাটি বাংলার জল
১১. শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান
১২. সঙ্কোচের বিহ্বলতা, নিজেরে অপমান
১৩. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
১৪. নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
১৫. দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
১৬. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে।[৩৭]

এরপর স্থান ছিল কাজী নজরুল ইসলামের। কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর গানের তালিকায় আছে:

১. এই শিকল পরা ছল
২. ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
৩. চল্ চল্ চল
৪. দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
৫. তোরা সব জয় ধ্বনি কর

৬. মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম
৭. জাগো অনশন— বন্দী ওঠ রে যত
৮. জাগো নারী বহ্নিশিখা
৯. একি অপরূপ রূপে মা তোমার
১০. আজ সৃষ্টি— সুখের উল্লাসে।[৩৮]

বিশ শতকের চল্লিশ দশকে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘের অনেকে বিভিন্ন ভাষায় গান রচনা করেছিলেন। সুর দিয়েছিলেন বা লিখেছেন যেমন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা বিভিন্ন স্বদেশি গানও কোরাসের মাধ্যমে গণসংগীত রূপান্তর করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরা অনেক গেয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে খাজা আহম্মদ আব্বাস লিখেছিলেন :

"For through famine or invasion, imperialist oppression or proletarian upsurge, the voice of Tagore remains the voice of Bengal consoling, exhorting the people of great unhappy land."[৩৯]

গণনাট্য সংঘের আন্দোলনের সময় গাওয়া সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস বা ভূপেন হাজারিকার গানই বেশি প্রচারিত হয়েছে, বিশেষ করে সলিল চৌধুরীর। যেমন :

১. আমার প্রতিবাদের ভাষা
২. মানব না এই বন্ধনে
৩. বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
৪. ঢেউ ছুটছে কারা ছুটছে
৫. ও আলোর পথযাত্রী

এ গানের ক্ষেত্রেও তিনি লোকগীতির সুর ভেঙে সুর দেওয়ার কাজ করেছেন। জীবনে জীবনে, যোগ করার আগ্রহে অধিকাংশ সময় গণসংগীতকারেরা লোকগীতির ভাষা ও সুর ধার করতেন। তবে সলিল চৌধুরী ছিলেন বিপরীত।[৪০] "তাঁর সাংগঠনিক শিক্ষার সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান ছিল পাশ্চাত্য সংগীত। পিতার সংগৃহীত অজস্র সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা ও নিগ্রো স্পিরিচুয়ালের মতো পশ্চিমা লোকসংগীতের রেকর্ড শুনে তিনি বড় হয়েছেন।"[৪১]

৭

ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যেসব গান রচিত হয়েছিল, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সেগুলো পুনঃপ্রচার হয়েছে। এর অধিকাংশ ঢাকা বা চট্টগ্রামের ষ্টুডিও রেকর্ড বা ঢাকায় প্রকাশিত গ্রামোফোন রেকর্ড। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গাজী মাজহারুল আনোয়ার রচিত সিনেমার গান 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। (সুরকার : আনোয়ার পারভেজ) *কেন্দ্রের* অধিবেশনের শুরু ও শেষ হতো এই গান দিয়ে। বেলাল মোহাম্মদ-এর একটি তালিকা দিয়েছেন (রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি বাদে) :

১. কেঁদো না কেঁদো না মাগো
২. জনতার সংগ্রাম চলবেই : সিকান্দার আবু জাফর।
সুরকার : শেখ লুতফর রহমান
৩. সোনা সোনা সোনা : রচনা ও সুর : আব্দুল লতিফ।
শিল্পী : শাহনাজ রহমতুল্লাহ
৪. সালাম সালাম হাজার সালাম : ফজল-এ-খোদা।
৫. ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল : আবু বকর সিদ্দিক।
সুরকার : সাধন সরকার
৬. আমার নেতা, তোমার নেতা শেখ মুজিব : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।
সুরকার : সাধন সরকার
৭. রক্তেই যদি ফোটে জীবনের ফুল : শামসুল হুদা।
৮. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।
সুরকার : আলতাফ মাহমুদ[৪২]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ষ্টুডিওতে যেসব গান রেকর্ড করা হয়েছিল, তারও একটি তালিকা দিয়েছেন :

১. আমি শুনেছি আমার মায়ের কান্না : ফজল-এ-খোদা।
শিল্পী : মান্না হক
২. নোঙর তোল তোল সময় : নঈম গওহর।
সুরকার : সমর দাস
৩. একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে : গোবিন্দ হালদার।
শিল্পী : আপেল মাহমুদ

৪. ও বগিলারে কেন বা আলু : হরলাল রায়
শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ রায়
৫. অনেক রক্ত দিয়ে আমরা : টি এইচ শিকদার।
৬. অত্যাচারের পাষাণ কারা : আল মুজাহিদী
৭. সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের। গীতিকার ও সুরকার : মোকসেদ আলী সাঁই। শিল্পী : আবদুল জব্বার ও কোরাস।
৮. তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর। গীতিকার ও সুরকার : আপেল মাহমুদ। শিল্পী : আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায় ও অন্যান্য
৯. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে : গোবিন্দ হালদার। শিল্পী : স্বপ্না রায়
১০. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে : গোবিন্দ হালদার। সুরকার : সমর দাস
১১. আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা : খন্দকার নেওয়াজিস আহমেদ। সুরকার : আবদুল জব্বার।
১২. মুক্তির একই পথ সংগ্রাম : শহীদুল ইসলাম।
১৩. জগৎবাসী বাংলাদেশকে যাও দেখিয়া : সরদার আলাউদ্দীন।
১৪. রুখে দাঁড়াও : সরদার আলাউদ্দীন।
১৫. মানুষ হ মানুষ হ : গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ।[৪৩]

বলাবাহুল্য, তালিকাটি অসম্পূর্ণ। আসলে *কেন্দ্রের* ইতিহাস লেখা হলেও, কারা কীভাবে গান লিখেছেন, কী কী গান লিখেছেন, তার অভিঘাত কী ছিল, সম্পূর্ণ গানের তালিকা-এ সম্পর্কে তথ্য প্রায় নেই বললেই চলে। বেলাল মোহাম্মদের ওই তালিকা ছাড়া অন্যান্য তথ্য থেকে কিছু গানের তালিকা পাই। ধরে নিতে পারি, তার কিছু *কেন্দ্রের* ষ্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়েছিল। যেমন :

১. অনেক ভুলের মাশুল তো ভাই : অনল চট্টোপাধ্যায়। সুর : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
২. আমাদের চেতনার সৈকতে : নাজিম মাহমুদ। সুর : সাধন সরকার।
৩. আজি সপ্ত সাগর ওঠে উচ্ছলিয়া : সত্যেন সেন। সুর : অজিত রায়।
৪. উঠলো রে ঝড় দিন বদলের পালা : ওমর শেখ
৫. একুশ আসে জানাতে বিশ্বে : লোকমান হোসেন জাকির
৬. এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে : খান আতাউর রহমান (এটি খুব সম্ভব আগে রেকর্ড করা)
৭. ও বাজান চল যাই চল : জসীমউদ্‌দীন
৮. ওরে ভাইরে ভাই বাংলাদেশে বাঙালী আর নাই : আনিসুল হক চৌধুরী। সুর : শেখ লুতফর রহমান।
৯. ও হে কালা চাঁদ : রুহুল আমিন প্রামাণিক। সুর : আবদুল আজীজ বাচ্চু।
১০. ওরে মাঝি দে নৌকা : শহীদ সাবের। সুর : শেখ লুতফর রহমান
১১. কারখানাতে খেত খামারে : এনামুল হক। সুর : আলতাফ মাহমুদ
১২. কে কে যাবি আয় রে। কথা ও সুর : ইন্দ্রমোহন রাজবংশী
১৩. ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে : বদরুল হাসান। সুর : আলতাফ মাহমুদ
১৪. চলছে মিছিল চলবে মিছিল। দিলওয়ার। সুর : অজিত রায়
১৫. জলপথে প্রান্তরে সাগরের বন্দরে : মুস্তাফিজুর রহমান। সুর : সমর দাস।
১৬. ডিম পাড়ে হাঁসে খায় বাগডাশে : ফেরদৌস হোসেন ভুঁইয়া, সুর : সুখেন্দু চক্রবর্তী
১৭. তারা এ দেশের সবুজ ধানের শীষে : মো. মনিরুজ্জামান। সুর : সমর দাস
১৮. দুর হতে আসে ঐ মৃত্যুর পরোয়ানা : চিরঞ্জীব দাশ শর্মা। সুর : সমর দাস
১৯. নিষ্ফল কভু হয় না এ ধরায় : নাজিম সেলিম বুলবুল। সুর : সমর দাস
২০. প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও : স্বাধীন দাশগুপ্ত। সুর : সমর দাস
২১. ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুর : শেখ লুতফর রহমান।
২২. মিলিত প্রাণের কলরবে : হাসান হাফিজুর রহমান। সুর : শেখ লুতফর রহমান
২৩. মানুষের ভালোবাসি এই মোর অপরাধ : সত্যেন সেন। সুর : শেখ লুতফর রহমান
২৪. মুজিব বাইয়া যাও রে : মোহাম্মদ শফি।

২৫. মাগো তোমার সোনার মানিক : রাহাত খান। সুর : সুখেন্দু চক্রবর্তী
২৬. যায় যদি যাক প্রাণ : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সুর : সুখেন্দু চক্রবর্তী।
২৭. রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি : আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। সুরকার : সুজেয় শ্যাম
২৮. স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে : আখতার হুসেন। সুর : অজিত রায়[৪৪]

এ তালিকাও অসম্পূর্ণ বলে আমার ধারণা। তবে, একটি বিষয় লক্ষণীয়, ১৯০৫-এর পর থেকে স্বদেশি গানের বিষয়ের যে কথা ও সুর, সে ঐতিহ্য মেনেই রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গান (*কেন্দ্র* রেকর্ডকৃত)। কামাল লোহানী বলেছিলেন, সে সময় সবকিছুর অভাব ছিল, গীতিকার সুরকার, গায়কের। কিন্তু অভাব বোধ হয়নি। কারণ যার যা সম্বল তাই নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন প্রবল উৎসাহে।

স্বাধীন বাংলা বেতারে পরিবেশিত গান খবরেরও বিষয় ছিল, যেমন : কলকাতা, ২ জুন— আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'অগ্নিশিখা' নামক এক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক গণ-সংগীত পরিবেশন করা হয়।

ওই 'আন্তর্জাতিক' সংগীত ছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কৃত 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর বঙ্গানুবাদ। ওই অনুষ্ঠানেই নজরুলের প্রসিদ্ধ 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' সংগীত এবং সুকান্তর 'বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত' কবিতা ও পরিবেশন করা হয়েছে।[৪৫]

সব গানই যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা নয়। রাষ্ট্রভাষা, উনসত্তরকে ভিত্তি করে কেন্দ্রের ষ্টুডিও থেকে রেকর্ডকৃত যেসব গান জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এখনো জনপ্রিয়, সেগুলো হলো :

১. জয় বাংলা বাংলার জয়
২. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
৩. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে
৪. সালাম সালাম হাজার সালাম
৫. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

৬. এক নদী রক্ত পেরিয়ে
৭. ছোটদের বড়দের সকলের
৮. তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর
৯. মুজিব বাইয়া যাওরে
১০. রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি
১১. সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের

কেন্দ্রের এমএলএ ইনচার্জ ছিলেন আবদুল মান্নান। নভেম্বরে তিনি বেলাল মোহাম্মদকে বললেন, 'জয় বাংলার জয়' অধিবেশনের শেষে না বাজাতে। এর বদলে 'আমার সোনার বাংলা' বাজাতে। লিখেছেন বেলাল মোহাম্মদ, "আব্দুল মান্নানের কথায় একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল, জাতীয় সংগীতের প্রচার প্রবর্তনের জন্য বন্ধু ও প্রভাবশালী মহল থেকে চাপ এসেছিল। এ ছাড়া তিনি বলে ফেলেছিলেন : জয় বাংলা গানটির শেষ অংশ একটা কথা আছে। ভুখা আর বেকারের মিছিল এটা এখন প্রচার না করাই ভালো। সে গানটির প্রচার সম্পূর্ণ রহিত হয়েছিল। এবং 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে বাজানোও বন্ধ হয়েছিল। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে।[৪৬]

আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে অন্যদের টানাপোড়েন মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। *কেন্দ্র* যখন কালুরঘাটে শুরু হয় তখন এর নাম 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।' জিয়ার নির্দেশে 'বিপ্লবী' শব্দটি পরিহার করতে হয়েছিল। কিন্তু এসব তুচ্ছ। কেন্দ্রের গান প্রচণ্ড অভিঘাত হেনেছিল মানুষের মনে। রূপা ফরহাদ লিখেছেন, "যুদ্ধ নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত, ঠিক তখনই বছর ঘুরে চলে এলো ঈদ। যেখানে দেশ বিপন্ন সেখানে ঈদ কাকে আনন্দ দেবে? তাই শহীদুল ইসলাম ভাই ঈদের চাঁদকে ফিরে যেতে বলে গান রচনা করলেন, 'চাঁদ তুমি ফিরে যাও দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা' সুর দিলেন অজিতদা, গানটি গাইলাম আমি। প্রচার হলো ঈদের চাঁদটি যে মুহূর্তে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে। সন্ধ্যা থেকে পরদিন বহুবার প্রচারিত হয়েছে এ গান। হৃদয়বিদারক এ গানটি শ্রোতাদের হৃদয় নাড়া দিয়েছিল। বেতার কেন্দ্রে প্রচুর অভিনন্দনপত্র এসেছিল। পরে শুনেছি দেশে অনেক মানুষ কেঁদেছে এ গানটি শুনে।"[৪৭]

৮

শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী শরণার্থীদের জন্য গঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি,' সংক্ষেপে বুদ্ধিজীবী সমিতি। এখানে বামঘেঁষা, মধ্যবাম, কোনো দল না করা সংস্কৃতিসেবীদের নিয়ে বহুদিন পর একটি মঞ্চ করা সম্ভব হয়েছিল, এবং তার প্রধান কারণ আবেগ। বাংলাদেশের অনেক শিল্পী সাহিত্যিক পরিচিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৪০-৫০-এর দশকে, তাঁদের অনেকে একত্রে কাজও করেছেন। অন্য আরেকটি বিষয় ছিল, এক সময়ের পূর্ববঙ্গে তাঁদের জন্ম যার স্মৃতি তখনও অম্লান।

তবে, শুধু আবেগ দিয়ে সংগঠন হয় না। এই সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিআই)-এর সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমিতি অনেক কাজ করেছে, আমি তার ফিরিস্তি দেব না। শুধু গান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই উল্লেখ করব।

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো ১৭ এপ্রিল। ১৮ এপ্রিল কলকাতা উপ-দূতাবাসের প্রধান উপ-হাই কমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করলেন। মুক্তিযুদ্ধে এটি একটি মাইলফলক ঘটনা। আর এই উদ্যোগকে স্মরণ করে রাখার জন্য বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী সমিতি মিছিলের আয়োজন করে। এবং সেখান থেকেই শুরু হয় গানের জয়যাত্রা।

উপ-হাইকমিশনের সামনে সকালে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পীরা মিছিল করে এলেন। হোসেন আলী মিছিল দেখে বেরিয়ে এলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ গাইলেন, 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'। হোসেন আলী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন। গাওয়া হলো, 'আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও তরণী/ তোমায় অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী'। তারপর সমবেতভাবে গাওয়া হলো, 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি'। সবার চোখে আনন্দাশ্রু। কোলাকুলি। সেদিন 'এআইবিই'-এর নেতৃত্বে ব্যাংক কর্মচারীরা এক দিনের বেতন তুলে দিলেন হোসেন আলীর কাছে। দীপেন্দ্রনাথ হোসেন আলীর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিলেন, যা ছাপা হলো দৈনিক *কালান্তর*-এ। কলকাতার বিভিন্ন পেশায় অসংখ্য মানুষ এবং সংগঠন প্রায় নিয়মিতভাবেই মিছিল করে এসে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।[৪৮]

২০ এপ্রিল বুদ্ধিজীবী সমিতি এক মিছিলের আয়োজন করে। বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সরকারও মুক্তিসংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মিছিলটি সংগঠন করা হয়। নবীন ও প্রবীণেরা যোগ দেন মিছিলে। সেদিন ছিল প্রবল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মিছিলটি শুরু হয় চৌরঙ্গীর টাটা বিল্ডিং থেকে। শেষ হয় বাংলাদেশ মিশনের সামনে। পথে তাঁরা স্মারকলিপি দিতে যান ব্রিটিশ, তারপর মার্কিন ও সোভিয়েত দূতাবাসে। ব্রিটিশ ও মার্কিন দূতাবাসের কূটনীতিকেরা স্মারকলিপি গ্রহণ করেছিলেন কি না জানা যায়নি, তবে সোভিয়েত কনসাল জেনারেল ওই স্মারকলিপি সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী ও তার স্ত্রী বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। হোসেন আলী বলেন, 'আমরা আপনাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারাই আমাদের ভরসা জুগিয়েছেন।' এরপর সমবেত শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা একযোগে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে শুরু করলে জনাব ও বেগম আলী অভিভূত হয়ে পড়েন।[৪৯]

জুলাই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকেই কলকাতা পৌঁছালেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন অনেকে। এই শিল্পী-সাহিত্যিকদের কথা মনে রেখে 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সমিতি' এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রস্তাব করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন এর প্রধান সংগঠক।

সন্‌জীদা খাতুন তখন পার্ক সার্কাসের নাসিরুদ্দীন রোডে থাকেন। দীপেন্দ্রনাথ ও প্রকাশক প্রসূন বসু এলেন সন্‌জীদার কাছে। বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়? দীপেন্দ্রনাথের প্রস্তাব ছিল সবাইকে একসঙ্গে কমিউনের মতো রেখে প্রথমে মহড়া দেওয়া হোক, তারপর অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হোক। সন্‌জীদা খাতুন বললেন, সেটি কার্যকর করা যাবে না, বরং একটি মহড়ার জায়গা পেলে সেখানে সবাই মিলিত হতে পারেন। সহায়ক সমিতির অফিস ছিল ধর্মতলার ১৪৪ লেনিন সরণি। ঠিক হলো সন্‌জীদা খাতুন এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করবেন।

সন্‌জীদার কাছে বাংলাদেশের শিল্পীদের অনেকের ফোন নম্বর, ঠিকানা ছিল। তিনি তাঁদের জড়ো করে কী কী করা যেতে পারে তা ঠিক করলেন :

১. ছায়ানটের মেয়েরা গাইবেন সিকান্দার আবু জাফরের লেখা শেষ লুতফর রহমানের সুরা করা :
জনতার সংগ্রাম চলবে
ওরা আরও গাইবেন—
- বিপ্লবের রক্ত রাঙা ঝান্ডা ওড়ে আকাশে
- ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
- ওরে বিষম দইর‌্যার ঢেউ উথাল পাথাল করে

২. খুলনার কালীপদ রায় ঠিক করলেন গাওয়া হবে
- ব্যারিকেড, বেয়নেট বেড়াজাল/ পাকে পাকে তড়পায় সমকাল— এটি লিখেছিলেন কবি আবু বকর সিদ্দিক আর সুর দিয়েছিলেন সাধন রায়।

৩. রাজশাহীর সরোয়ার জাহান আর রফিকুল আলম প্রস্তাব করলেন আইপিটিএর গান :
- আমার প্রতিবাদের ভাষা ও
- জাগো জাগো প্রদীপ নিভায়ে দাও। শেষোক্তটির কথা ও সুর সরোয়ার জাহানের।

৪. প্রথমে এইসব গানের মহড়ার পর আরও কিছু গান যুক্ত হলো : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
- সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে
- দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
- ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা, জল দে
- আমার সোনার বাংলা

কাজী নজরুল ইসলামের
- কারার ঐ লৌহকপাট
- এই শিকল পড়া ছল মোদের
- এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু
- বল ভাই মাভৈ মাভৈ, নবযুগ ওই এলো ওই।

আরও যুক্ত হলো আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর— আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।

গান তো হলো, এখন পরম্পরা তৈরি করে সাজানো। জহির রায়হানকে অনুরোধ করা হলো। তিনি তখন *ষ্টপ জেনোসাইড* নিয়ে ব্যস্ত। দায়িত্ব দেওয়া হলো অতি তরুণ শাহরিয়ার কবিরকে। তিনি পরম্পরা তৈরি করে

নির্মাণ করলেন 'রূপান্তরের গান'। ঠিক হলো হাসান ইমাম ভাষ্য পাঠ করবেন আর মঞ্চসজ্জা করবেন মুস্তাফা মনোয়ার।[৫০]

রূপান্তরের গান—এর বিস্তারিত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। সেখান থেকে আরও কিছু তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছিল— দেশ বিভাগের পর সীমান্তপারের সংগীতশিল্পীদের এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দল ভারতবর্ষে, কলকাতা শহরে এই প্রথম গান গাইছেন।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষিত হওয়ার পর নবজাত রাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলের শিল্পীরা এই প্রথম এক জায়গায় মিলিত হয়েছেন এবং পঁচিশে মার্চের রক্তাক্ত দিনগুলো অতিক্রম করে বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছেন তাঁদের প্রথম সম্মেলক অনুষ্ঠান।

পরিচালনা স্বনামধ্য সন্‌জীদা খাতুন। সূত্রধর : চলচ্চিত্রজগতের যশস্বী নট হাসান ইমাম।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে কারা অংশ নিয়েছিলেন, তারও একটা তালিকা পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনে।

রবীন্দ্রসংগীত— শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, সাগর সেন।

আবৃত্তি— শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অর্পনা সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ।[৫১]

বিজ্ঞাপনে দেবব্রত বিশ্বাসের নাম নেই।

কিন্তু সন্‌জীদা জানাচ্ছেন, "দেবব্রত মহা ঝামেলা করেছিলেন যে তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, আমাদের সঙ্গেই গাইবেন। কিশোরগঞ্জ তাঁর দেশ। কী উপায়ে সামাল দেওয়া গিয়েছিল সে কথা মনে নেই।"[৫২]

অনুষ্ঠান হয়েছিল দুদিন। ৩ জুলাই, সন্ধ্যা ছয়টা, আর ৪ জুলাই, সকাল নটা। স্থান রবীন্দ্রসদন।

সন্‌জীদা খাতুন দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে 'ঝামেলার' কথা বলেছিলেন, তা মিটেছিল অন্যভাবে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম দিন বাংলাদেশের শিল্পীদের গান, 'রূপান্তরের গান' আর দেবব্রত বিশ্বাসের তিনখানি সংগীত পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের গান ও আবৃত্তি। বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানা যায়, বাংলাদেশের ওপর এই প্রথম একটি নাটিকা লিখলেন বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকার শাহরিয়ার কবির এবং সেটি মঞ্চস্থ করছেন বাংলাদেশেরই প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পীরা।

দীপেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন উদ্বোধনী গান যেন সন্‌জীদারই গান। সন্‌জীদা গেয়েছিলেন, 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'। টিকিটের হার ছিল ২৫, ১০, ৫ ও ৩ টাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুচিত্রা মিত্র। দীপেন্দ্রনাথ প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। চল্লিশ দশকের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরই অবিকল রূপ ১৯৭১ সালেও ঘটতে যাচ্ছে। দেবব্রত বিশ্বাস এরপর রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। সেদিন ছিল প্রবল বৃষ্টি। তবে 'রূপান্তরের গান' সামগ্রিকভাবে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছে। তবে এতে সংগ্রামী ইতিহাসের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার কয়েকটি জায়গায় ভুল ছিল বলে বেশ কয়েকজন দর্শককে অভিযোগ করতে এবং বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেছে।[৫৪]

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মিশনের হোসেন আলী। তিনি বলেন, "পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গণজাগরণে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ ব্যাপারে আপনারা অনেক করেছেন এবং করবেন আশা করি।"[৫৫]

সন্‌জীদা জানিয়েছেন, বিশ হাজার টাকা উঠেছিল দুই দিনে। তারপর তাদের সঙ্গে সহায়ক সমিতির তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁর ভাষায়, "অনুষ্ঠান চুকে গেলে দীপেন বললেন— এবার আপনারা নিজেরা সংস্থা গড়ে কাজ করুন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে "লিবারেশন ফ্রন্ট" নামে এক প্রতিষ্ঠান হয়েছিল। তাতে ওয়াহিদুল হক, জহির রায়হান, হাসান ইমাম এঁরা ছিলেন। ওঁদের পক্ষের প্রতিনিধি এসে আমাকে সভাপতি করে আর বেনু মাহমুদুর রহমান মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা গড়ে দিয়ে গেলেন।"[৫৬]

'রূপান্তরের গান' ১৮ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার কমলা গার্লস হাই স্কুলেও পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে, সিপিআইয়ের সাবেক সম্পাদক পূরণ চাঁদ যোশী। "সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন— বহুকাল পরে এমন উপভোগ্য অনুপ্রেরণা সঞ্চারক অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বাংলাদেশের শিল্পীদের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থদান করেন।"[৫৭] বুদ্ধিজীবী সমিতিই এই আয়োজন করেছিল। অর্থাৎ সন্‌জীদা খাতুন যে বলেছেন, রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানের পরই বাংলাদেশের শিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল, তা নয়। সেটি ছিল, তবে, আগস্ট থেকে হয়তো তাঁরা আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান করেছেন।

৯

দিলীপ চক্রবর্তী তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ৯ মে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রস্তাব করেন পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘের সাধারণ সম্পাদক গুরুদাশ দাশগুপ্ত। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী যুব সংঘ ও ছাত্র ফেডারেশন পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৮ সালে আবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'বুদ্ধিজীবী সমিতি' রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করেন। সাক্ষাৎকারটি বই প্রকাশের ২০ বছর আগের। হয়তো স্মৃতি তখন দুর্বল, অনুমান করে নিতে পারি, ৯ মে রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোগ নিয়েছিল যুব সংঘ ও ছাত্র ফেডারেশন। কিন্তু অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন 'বুদ্ধিজীবী সমিতি'র নেতারা। অনুষ্ঠানের দুরকম বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। আমি তার সমন্বিত রূপ তুলে ধরছি।

'এই কথাটি ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে'— রবীন্দ্রনাথের এই গান দিয়ে শুরু করলেন সুচিত্রা মিত্র। রণেশ দাশগুপ্ত বক্তৃতা দিলেন। বিষয় : রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা কীভাবে তরুণদের লড়াইয়ে উদ্দীপ্ত করেছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অন্ধ দোতারা বাদক মো. কমরউদ্দীন যখন গাইলেন, "যায় যদি যাক প্রাণ— দেব না দেব না দেব না গোলার ধান" অথবা পশ্চিম বাংলার নির্মলেন্দু চৌধুরী যখন গাইলেন, "রাম কান্দে রহিমের লাগিয়া" সে সময় অন্য এক ছবি— পাক আক্রমণে পর্যদুস্ত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের শরণার্থীরা ভারতে আসা, মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানুষের দৃঢ় অঙ্গীকার আর শরণার্থী এবং লড়াকু মানুষের প্রতি ভারতের সাধারণ মানুষের অনুভূতির ছবিই যেন সকলের সামনে ভেসে উঠল।"[৫৮]

অনুষ্ঠানে কবরী চৌধুরীর (অভিনেত্রী কবরী) বক্তৃতা সবাইকে উদ্বেলিত করেছিল। তিনি তখন মাত্র পৌঁছেছেন কলকাতায়। লিখেছেন তিনি, "বাংলাদেশ মিশনের সামনে অনুষ্ঠান। লোকে লোকারণ্য। আয়োজকরা আমাকে বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠায়। হায় হায় কী বক্তৃতা করব— জীবনে তো শুধুই অভিনয় করেছি। একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে রুপালি পর্দার শীর্ষ অভিনেত্রী, অন্যদিকে অনাহারক্লিষ্ট কর্মহীন জীবন-মরণ লড়াইয়ে নামা একজন শরণার্থী। মা-বাবা ভাইবোন আত্মীয় সব ফেলে ঘরছাড়া, দেশছাড়া। পাকিস্তানি কুকুরদের হাত থেকে বাঁচতে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুঃখ কষ্ট মান সম্মানের কথা ভাবতেই গলা শুকিয়ে আসে। কোনো আওয়াজ বার হতে চায় না। তবু মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে অনেক কথা বলে ফেলি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাতে না জানাতেই জ্ঞান হারিয়ে মঞ্চে পড়ে যাই।[৫৯]

ওই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন দিলীপ চক্রবর্তীও। কবরী বললেন, '২৩ বছর গোলামী করে ওদের খুশি করতে পারিনি। পৃথিবীর মানব দরবারে প্রার্থনা করি, আমরা যেন বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে মানুষের মতন বাঁচতে পারি।' তাঁর গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে গেল, তিনি একেবারেই ভেঙে পড়লেন। কবরীর চোখের জলের ছোঁয়ায় তখন মঞ্চে উপস্থিত অন্যদের ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। সবার স্তব্ধ চোখে জল, এমন সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে কলকাতার নামকরা শিশুচিকিৎসক ডা. মনি বিশ্বাস শ্লোগান দিলেন 'জয় বাংলা'। তখন সবিতাব্রত দত্ত মাইকে মাইকে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন, 'বাঁচব বাঁচবরে মোরা ভাঙ্গা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাঙলা গড়ব।'[৬০] কবরীর বক্তৃতার অংশ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন রাতে সংবাদ পরিক্রমায় শুনিয়েছিলেন।

গোলাম মুরশিদও এর বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য বর্ণনা থেকে তাঁর বর্ণনা বিস্তৃত। তিনি লিখেছেন, "উঁচু এক মঞ্চও করা হয়েছে। বিরাট জনতা। গান কিন্তু বড়ো একটা কেউ শুনছে না। একসময় মঞ্চে উঠলেন সুচিত্রা মিত্র। দেখে বিস্মিত হলাম, তাঁর গান চলছে একদিকে, অন্যদিকে যে যার মতো কথাও বলছে। তারপর মঞ্চে এলেন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীরা রুমা গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে। রুমা গাইলেন ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত সেই গান বিস্তীর্ণ দুপারে...গঙ্গা তুমি বইছ কেন? এ গানের মধ্যে যে মানবতার কথা আছে, সেটাই যেন উপস্থিত জনতার হৃদয়কে স্পর্শ করলো। রুমা গুহঠাকুরতার সঙ্গীরা হারমোনাইজ করার যে চেষ্টা করেছিলেন, তাও নূতনত্বের স্বাদ দিয়েছিল।

'এরপর মঞ্চে এলেন কাজী সব্যসাচী। সব্যসাচী পড়তে আরম্ভ করলেন: "নম, নম, নম বাংলাদেশ" একটি কবিতা পড়তে গিয়ে এক সময়ে সব্যসাচী এমন করে কাঁধের ঝাঁকুনি দিলেন যে, তাঁকে সত্যি সত্যিই হঠাৎ সিংহের মতোই মনে হলো।

বাংলাদেশের গায়ক-গায়িকারাও ছিলেন। তারা সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, গেয়েছিলেন বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক কিছু গান। তার মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা "যায় যদি যাক প্রাণ— দেবো না গোলার ধান" গানটার কথা এখনো মনে আছে। তা ছাড়া জনতার সংগ্রাম লড়বেই, আমার প্রতিবাদের ভাষা ইত্যাদি গানও ছিল। শ্রোতারা সেসব গান শুনে খুব হাততালি দিয়েছিলেন। এই শিল্পীরা সেদিন রবীন্দ্রসদনেও গান গেয়েছিলেন।

'বেলা ১২টার দিকে মঞ্চে উঠলেন স্বপনগুপ্ত। দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে গান শিখেছেন, অন্ধ। তবলচি চলে যাচ্ছে, মানুষজনও। স্বপনগুপ্ত কোনো পরোয়া না করে সঙ্গে সঙ্গেই গেয়ে উঠলেন, 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে? পথ জুড়ে কি করবি বড়াই সরতে হবে!' সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে নীরবতা নেমে এল। তবলচিও এসে জুটলো... এ গান শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, '৭১-এর ভাবী যুদ্ধের কথা মনে রেখেই তিনি এ গানটা রচনা করেছিলেন। এ গানটা শেষ হতেই স্বপন গুপ্ত ধরলেন: 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' আবার জনতার সেই নীরব প্রশংসা। গান আমি বহু শুনেছি। দেবব্রত বিশ্বাসের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর গান শুনেছি। কিন্তু সেদিন তাঁর ছাত্রের কণ্ঠে গান শুনে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা এক কথাতে অসাধারণ। কলকাতার শিল্পীরা সেদিন জোড়াসাঁকোর অনুষ্ঠানের চেয়েও বাংলাদেশ মিশনের অনুষ্ঠানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।"[৬১]

আগস্ট ১৮ কী ১৯ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল ময়দানে। প্রতিবেদকের মতে, লোকের অভাব হয়নি। এই সমাবেশে সিনেমা স্টাররাও ছিলেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছিল, ধাক্কাধাক্কি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "ময়দানে সেই প্রচণ্ড ভিড় ও ঠেলাঠেলির ফলে বহু লেখক বুদ্ধিজীবী শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকতে পারেননি। অনেকে নিরাশ চিত্তে ফিরে গেছেন। কোনোরকমে একটি রেজোলিউশান পাঠ করা হয়েছিল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেছেন ও একটি দুটি গান।"

সমিতির শেষ অনুষ্ঠানের খবর পাই ডিসেম্বরে। ইতিমধ্যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ লেখক সমিতি ও বুদ্ধিজীবী সমিতি ১০ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটায় শহীদ মিনারে এক যৌথ সভা আহ্বান করে। সভায় গোপাল হালদার বলেন, "এই অনবদ্য আত্মত্যাগের মধ্যেই পৃথিবীতে বাঙালি নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া যোগ্যতা অর্জন করেছে।"

শিল্পী কামরুল হাসান বলেন, "এখন আমরা আর কেউ পৃথকভাবে শিল্পী নই, সবাই মুক্তিকামী সৈনিক। মুক্তির পর আমাদের সামনে পর্বত প্রমাণ দায়িত্ব পড়ে আছে।" শওকত ওসমান বলেন, "ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আমাদের ঋণ কোনো দিন শোধ করা যাবে না। আমাদের সাফল্যের পর আপনাদের কাছে ও দেশে যাবার আমন্ত্রণ রইল; সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে আমরা আলিঙ্গন করতে উন্মুখ।" পশ্চিমবঙ্গ লেখক সমিতির

আহ্বায়ক সন্তোষ কুমার ঘোষ বলেন, "আমার জীবিতকালে আর কখনোই ভারতবাসী হিসেবে নিজেকে এত গৌরবান্বিত বোধ করিনি।" এ ছাড়া সভায় বক্তব্য দেন মাজহারুল ইসলাম, মনোজ বসু ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ড. রমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় রবীন্দ্রসংগীত ও দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত। রুমা গুহঠাকুরতা ও তাঁর ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার বাংলাদেশ নিয়ে লেখা প্রেমধাওয়ানের রচিত একটি গান পরিবেশন করেন। আবৃত্তি করেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র।[৬২]

১০

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মনোজগত দখল করার আগে একটি গান বাঙালির মনোজগত দখল করে ফেলেছিল।

এখানো সে গানটি জনপ্রিয়। গানটি লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, ১৯৭১ এ যেসব গান জনপ্রিয় হয়েছে, মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে, তার অধিকাংশই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর গোবিন্দ হালদারের লেখা। বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা গানটি দিয়ে শুরু করা যাক।

কলকাতার গড়িয়ায় একটি চায়ের দোকানে আড্ডা চলছে। মুক্তিযুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে। গৌরীপ্রসন্ন, লোকসংগীতশিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী ও সুরকার গায়ক অংশুমান রায়। চা খেতে খেতে গৌরীপ্রসন্ন পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ দুই বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জানালেন, তিনি একটি গান লিখেছেন। কেমন হয়েছে, পড়া শেষ করে অংশুমান বলে উঠলেন, দারুণ! দারুণ! এটা গৌরীদা কাউকে দিতে পারবেন না। আমি সুর দেব, আমি গাইব। তারপর ওই চায়ের দোকানে বসেই অংশুমান গানের সুর দিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর অংশুমান গেয়ে ওঠেন, 'শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি'। সবাই হতবাক। একবাক্যে বললেন দারুণ গান।

'এর কয়েক দিন পর কামরুল হাসান এসেছেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায়। অংশুমান রায় ও উপেন তরফদারও ছিলেন। অংশুমান তখন গানটি গাইলেন এবং উপেন তা রেকর্ড করলেন। মাঝে মাঝে ৭ই মার্চের ভাষণের কিছু কিছু অংশ যুক্ত করে আকাশবাণীতে প্রচারিত হলো। বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের পর ১৮ এপ্রিলও তা প্রচারিত হয়।[৬৩]

এই গান তখন কী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তা এখন বোঝানো যাবে না। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে এই গান প্রায়ই শোনা হতো গোপনে। কিছু রেকর্ডও পাচার হয়ে এসেছিল। অক্টোবরে চট্টগ্রামে একটি রেকর্ডে আমি গানটি প্রথম শুনি। এখনো এই গানটি মুক্তিযুদ্ধের গান হিসেবে জনপ্রিয়। অংশুমান রায় পরে আত্মহত্যা করেছিলেন।[৬৪]

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "৭১ সালে যাঁদের সঙ্গে গান গেয়েছি, যাঁরা গানের কথা লিখেছেন, সুর সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের অনেকেই আজ নেই। অথচ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাঁদের অবদানের কথা এখনও মনে অবিরত বাজছে।" সুচিত্রা মিত্রের অবদানের কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করে বলেন, "সে বছর বাংলাদেশ বিমানের সামনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তীর সভানেত্রীর ভাষণে সুচিত্রাদি একটিও কথা বললেন না। শুধু একটি গান গাইলেন, এই কথাটি মনে রাখিস। মুক্তি তোদের পেতেই হবে।"[৬৫]

যাঁরা বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করেছিলেন, সাহায্য করেছিলেন, রেকর্ড করেছেন তাঁদের একটি তালিকা দিয়েছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। তাঁরা হলেন, পঙ্কজ মল্লিক, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, সবিতাব্রত দত্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রাহুল দেব বর্মন, মান্না দে, ভূপেন হাজারিকা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, মৃণাল চক্রবর্তী, অমর পাল প্রমুখ। সুরকার ও গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, পুলক বন্দোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত ও শ্যামলগুপ্ত।[৬৬] তিনি একজন গীতিকারের নাম বলতে ভুলে গেছেন। তিনি হলেন গোবিন্দ হালদার।

গোবিন্দ হালদারের লেখা গানগুলোই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতারে এবং এখন জনপ্রিয়। তিনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার গান লিখেছেন বলে জানিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে। তবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা গান কটিই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি বলেন, "আমার সুনাম, আমার নাম, প্রতিষ্ঠাতা— সবকিছুই বাংলাদেশকে নিয়ে। বাংলাদেশ আমার জীবন, আমার উত্থান, আমার প্রতিষ্ঠা।"[৬৭]

তাঁর এক বন্ধু কামাল আহমেদ, তিনিই স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্য তাঁকে গান লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। কামাল তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন কামাল লোহানীর সঙ্গে। কামাল লোহানী তাঁকে অনুরোধ করেন কিছু গান লিখে

দিতে। তিনি ১৫টি গান একটি এক্সারসাইজ খাতায় লিখে তুলে দেন লোহানীর হাতে, আরেকটি কপি আপেল মাহমুদের কাছে। তারপর, বাংলাদেশের সুরকাররা সুর দিয়ে তাঁর গানগুলো গান। প্রথম প্রচারিত হয় আপেল মাহমুদের সুর ও তাঁরই গাওয়া 'একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি'। সমর দাশ সুর দেন 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'। স্বপ্না রায় গান 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে'।[৬৮]

ওই সময় গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিগুলো 'দেশের গান' প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠে। মুক্তিযুদ্ধ এবং 'বাংলা' সম্পর্কেও এ আবেগের সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পুরোনো গানও ছিল। ফলে 'দেশের গান' আবার প্রকাশ করা লাভজনক ছিল। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা জাগতে পারে এমন সব রেকর্ডও কোম্পানিগুলো বের করতে থাকে। এসব গান গেয়েছিলেন সমসাময়িক বিখ্যাত গায়কেরা। আমরা সম্পূর্ণ রেকর্ডের তালিকা তৈরি করতে পারিনি ; কারণ, এ সম্পর্কিত তথ্যের অভাব।

২৫ বৈশাখ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের রেকর্ড প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের দিয়ে গানগুলো গাওয়ানো হয় :

১. সন্‌জীদা খাতুন : আসা যাওয়া পথের ধারে; কাছে থেকে দূরে
২. ফাহমিদা খাতুন : এখনো তারে চোখে দেখিনি; ভরা থাক স্মৃতি সুধায়
৩. রাখী চক্রবর্তী : সখী ভাবনা কাহারে বলে, আহা; আজি এ বসন্তে
৪. কলিম শরাফী : দিন পরে যায় দিন, বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
৫. ইফফাত আরা দেওয়ান : আমি রূপে তোমায়; প্রভু বলো বলো

দেশ-এর সংগীত প্রতিবেদক লিখেছিলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের নতুন কণ্ঠ স্বাদ বদলের দিক থেকেও অভিনন্দনযোগ্য। এরা সকলেই ভালো গেয়েছেন। তবে, তাদের মধ্যে খাতুন ভগ্নীদ্বয় সন্‌জীদা ও ফাহমিদার গান খুবই পরিণত।[৬৯]

প্রতিবেদক বোধ হয় জানতেন না এঁরা সবাই বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পী, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন। আর কলিম শরাফী তো চল্লিশ দশকে গণনাট্য শিল্পী সংস্থার শিল্পী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। নীরদ চৌধুরীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কার রবীন্দ্রসংগীত তাঁর ভালো লাগে। তিনি বলেছিলেন, কলিম শরাফীর। কারণ, তাঁর গান সবার থেকে আলাদা।

দি গ্রামোফোন কোম্পানি 'বাংলা আমার বাংলা' সিরিজে 'সময়োপযোগী কয়েকটি রেকর্ড বের করে। কয়টি বের করেছিল সে তথ্য পাইনি। তবে দুটি রেকর্ডের সূত্র পেয়েছি।

১. মান্না দে ও সহশিল্পীবৃন্দ : আমার সোনার বাংলা
২. মান্না দে, সবিতা চৌধুরী ও সহশিল্পীবৃন্দ : আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে।[৭০]

মান্না দে ছাড়াও সুচিত্রা মিত্রের রেকর্ড বের হয়েছিল দুটি গান দিয়ে 'আমার সোনার বাংলা' ও 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে।' *দেশ*—সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, "গান দুটি সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে অনেক দিন ধরে দেশবাসীকে মাতিয়ে এসেছে। এখন যেন শ্রীমতী মিত্রের এই দুটি গান আরও বেশি ভালো লাগে। এই দুটি গানের ষ্ট্যান্ডার্ড প্লে রেকর্ডের মূল্য আজ অপরিসীম।" মান্না দের গাওয়া গান দুটি সম্পর্কে লিখেছিলেন— উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া এই দুটি গান মন উদ্দীপ্ত করে।[৭১]

আরেকটি রেকর্ডের কথা জানা যায়। গেয়েছিলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখা প্রণব রায়ের, সুর প্রবীর মজুমদার। গান দুটি হলো, ' সোনার আলো দেয়' ও এ দেশ আমার জন্মভূমি'।[৭২]

কলকাতা হিন্দুস্তান রেকর্ড 'মুক্তিযুদ্ধের গান' শিরোনামে ১৯৭১ সালে একগুচ্ছ রেকর্ড প্রকাশ করে। সুবিমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, তাঁর লেখা 'বুড়িগঙ্গা নদীরে' বের হলে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তখন কোম্পানির কর্ণধার শোভনলাল সাহা তাঁকে আরও কয়েকটি গান লিখে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। সুবিমল তখন বলেন, বাংলাদেশের ও কলকাতার শিল্পীদের দিয়ে কিছু গানের রেকর্ড বের করা হোক। প্রতিটি রেকর্ড শুধু সফলই নয়, এখনো স্মরণীয়।

এ পর্যায়ে প্রথম গান অংশুমান রায়ের 'শোন একটি মুজিবরের'। ষ্টুডিও রেকর্ড থাকলেও হিন্দুস্থান রেকর্ড এটি প্রকাশ করে। এর উল্টো পিঠে ছিল গানটির ইংরেজি অনুবাদ, অংশুমানের গাওয়া :

"The voice of not one but a million
Mujibur singing
Bangladesh, My Bangladesh"

সুবিমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'আমার মনে আছে, একটি 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং 'সংবাদ বিচিত্রায় 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে' গানটি

ব্যবহার করা হয়েছিল। তুমুল হইচই পড়ে যায় বাংলাদেশে। দাবানলের মতো গানটি ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে একদল মুক্তিসংগ্রামী এসে এই গানটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। বলেন, তারা যখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, তখন এই গানটি মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করে।[৭৩]

আরেকটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বিখ্যাত লোকশিল্পী অমর পালের কণ্ঠে। গানটির রচয়িতা সুবিমল ভট্টাচার্য। অংশুমান রায়ের রেকর্ডটি বের হওয়ার দেড়মাস পর এটি বের হয়—

"বুড়িগঙ্গা নদীরে
তোর বুকে ডিঙা আমি কেমনে রে ভাসাই
পানি রে তোর রক্তে রাঙা বৈঠা কান্দে তাই
বিদেশ থিকা আইল দুশমন শাসন করার ভানে
দ্যাশের মানুষ দ্যাশেই মারে বন্ধুকে কামানে
তারা মায়ের বুকে কুরবান লইয়া গাঙ্গে পাইল ঠাঁই....."
"গান বাজারে বেরনো মাত্রই সুপারহিট হয়ে বাজতে লাগল।"[৭৪]

'বুড়িগঙ্গা' ছাড়া হিন্দুস্থান রেকর্ড অমরপালের আরো দুটি গান রেকর্ড করে যা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। একটি হলো— 'দেশান্তরে ঘুইরা কত নদী দেখিলাম ভুলিতে পারি না তিতাস একটি নদীর নাম',

অন্যটি 'পশ্চিম দেশের গোসাইঠাকুর কতই জানেন চাতুরি কী চমৎকার দেখিলাম বাহাদুরি।'[৭৫]

অমর পাল সুবিমল ভট্টাচার্যের লেখা আরেকটি গান গেয়েছিলেন। তাও প্রকাশ করেছিল হিন্দস্থান রেকর্ড। এর শিরোনামে ছিল ইয়াহিয়ার পাঁচালী।

সুবিমল তাঁর স্মৃতি থেকে হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রকাশিত আরও কয়েকটি গানের তালিকা উল্লেখ করেছেন:

১. ও মোর বাংলারে। শিল্পী ও সুরকার: অমর পাল। গীতিকার: শেখ কামাল আহমেদ
২. আকাশে কান্দে বাতাস কান্দে। শিল্পী ও সুরকার: অমর পাল। গীতিকার: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. তোরা দেখ আসিয়া রে। শিল্পী ও সুরকার: অমর পাল। গীতিকার: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. আর কোথা নয়। শিল্পী ও সুরকার: মহ: আব্দুল জব্বার। গীতিকার: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. মোদের বাংলা সোনার বাংলা। শিল্পী: মহ: আব্দুল জব্বার। সুরকার: শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতিকার: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. ইয়াহিয়ার পাঁচালী। শিল্পী ও সুরকার: অমর পাল। গীতিকার: সুবিমল ভট্টাচার্য
৭. মুজিব বাইয়া যাওরে। শিল্পী ও সুরকার: মহ: আব্দুল জব্বার। গীতিকার: শহীদুল ইসলাম
৮. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি। শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার: আপেল মাহমুদ
৯. হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে। শিল্পী: মহ: আব্দুল জব্বার। সুরকার: বাপ্পী লাহিড়ী। গীতিকার: শ্যামল গুপ্ত
১০. সাত কোটি মানুষের আরেকটি নাম। শিল্পী: মহ: আব্দুল জব্বার। সুরকার: বাপ্পী লাহিড়ী। গীতিকার: শ্যামল গুপ্ত [৭৬]

হিন্দুস্তান রেকর্ড প্রকাশিত আরেকটি রেকর্ডের সন্ধান পেয়েছি যা এ তালিকায় নেই। রেকর্ডটি আছে 'গণহত্যা জাদুঘরে'। এর একপিঠে গানের শিরোনাম 'না না না'। কথা চন্দন। অপর পিঠে আছে 'জয়বাংলা'; কথা লক্ষীকান্ত রায়, সুর : প্রার্থনা মুখোপাধ্যায়।

সলিল চৌধুরী অন্যধরণের একটি রেকর্ড করলেন, কবরীকে দিয়ে। অনেকেই এটির কথা জানেন না। এর শিরোনাম 'আমি খালিদের মা বলছি।' *দেশ*-এর ভাষ্যকার এর একটি বিবরণ দিয়েছিলেন— "সলিল চৌধুরীর রচনা একটি করুণ রসাত্মক নকশা, যাতে বাংলাদেশের উপর পাক জঙ্গীশাহীর নির্মম অত্যাচারের চিত্রটি ফুটে উঠেছে, খালিদের মা বলছেন তার বিপর্যয়ের কথা। তাঁর স্বামী নিহত। খালিদ যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। ফরিদাকে খালিদের মা পুত্রবধূ করবেন ভেবে রেখেছিলেন। সেই ফরিদা মুক্তিবাহিনীতে। খালিদের মা চোখের জলে বলে যাচ্ছেন তার কাহিনি। কাসেমের স্ত্রী ধর্ষিতা, তাদের দুই ছেলে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল—কে কী করে বাঁচিয়ে রাখেবেন খালিদের মা। তুবও তিনি জানেন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জয় হবেই।

রচনাটি নাট্যরস আছে, যদিও দুটি ছেলে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল একটু বেশি কৃত্রিম, বেশি। সে যাই হোক কবরী চৌধুরীর অভিনয়ের গুণে খালিদার মার কাহিনি শুনতে শুনতে চোখে জল আসে স্পষ্ট।

প্রতিবেদক প্রশংসা করেছিলেন কবরীর।

"যেখানে যতটুকু দরকার সেখানে ততটুকু ঢেলে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মুভিটোনের এই রেকর্ডটি যে বহুল কদর হবে তা বলাই বাহুল্য।"[৭৭]

কবরী স্মৃতিকথায় লিখেছেন— "যদিও প্রথমে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে দিয়ে সেটা রেকর্ড করবার কথা ছিল। সলিলদা বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা চিন্তা করে আমাকে নেন। শিরোনাম দেন— 'আমি মজিদের মা বলছি।' পুরো স্ক্রিপ্টে যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচার, নির্যাতন, এইসব উঠে আসে। অকৃত্রিম আবেগে সত্যিকারের চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আবৃত্তি করে অভিনয় করি।"[৭৮] কবরী রেকর্ডের শিরোনামটি বোধহয় ভুল লিখেছেন। ৪৮ বছর পর লেখা। *দেশ* পত্রিকার শিরোনামটিই গ্রহণ করেছি যেহেতু তা সমসাময়িক।

তিমিরবরণের বৃন্দবাদর-এর আয়োজন করেছিল সুরেশ সংগীত সংসদ ৩০ শে জুন কলামন্দিরে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে তিনি রচনা করেছিলেন। 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সিম্ফনী'। সংগৃহীত অর্থ দেয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে।[৭৯]

১১

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে নানা 'বিচিত্রানুষ্ঠান' হয়েছে। এর ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা দুরূহ। এসব বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল গান। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

১. দক্ষিণ কলিকাতার টাকি হাউসে উত্তর ভারতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৭ এপ্রিল। সেখানে শুধু বাংলাদেশের গান গাওয়া হয়।[৮০]

২. ২৪ মে কলকাতার বসুশ্রীতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তার জন্য একক গানের অনুষ্ঠান করা হয়। গায়ক ছিলেন হেমাঙ্গ রায় চৌধুরী। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন সেখানে।[৮১]

৩. হিন্দি হাই স্কুল প্রেক্ষাগৃহে ২৪ মে সঞ্জীবন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে অংশুমান রায় গান শোনান আর টুকু নন্দী বাজান গিটার।[৮২]

৪. জলপাইগুড়িতে ১০ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত গোপালপুর হাউসে জলপাইগুড়ি সঙ্গীত সংসদ স্থানীয় ও বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথম দু'দিনের আয় ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয় বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পী মরিয়ম বেগম, সুলতানা শাহ, নওয়াজ প্রধান, দিলীপ করণ, খন্দকার মোকলেসুর রহমান ও আসগর আলী প্রধান কে।[৮৩]

৫. ২২ জুন বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদ রবীন্দ্র সদনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুই বাংলার শিল্পীরা এতে গান পরিবেশন করেন। বক্তৃতা দেন সৈয়দ আলী আহসান।[৮৪]

৬. গান সংস্কৃতি সংঘ আগস্ট মাসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'প্রতিরোধের গান' নামে।

একক ও সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে দুই বাঙলার শিল্পীরা শ্রোতাদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। এই অংশে সর্বমোট পনেরোটি গান ছিল।[৮৫]

"তবু বিশেষভাবে কয়েকটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হচ্ছে— 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়,' 'ভিড়ের তরী বন্দরে', 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালী' ও 'এবার সবে কাঁধে কাঁধ মিলায়ে।' বাংলাদেশের যে সব শিল্পী এই প্রতিরোধের গান গাইলেন তাঁরা হলেন— মাধুরী আচার্য, অসীম মুখার্জী, গৌর হালদার, বিউটি দাম, চম্পক সাহা, শক্তি বর্ধন ও দীপ্তি বর্ধন। অংশগ্রহণকারী পশ্চিম বাঙলার শিল্পীরা হলেন— দেবনাথ চক্রবর্তী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমূল্য চট্টোপাধ্যায়, সুকোমল দেব, সৌরেন সেনগুপ্ত, সুপ্তি কুমার, সন্ধ্যা চন্দ, রেবা মোহান্ত ও সাথী গুপ্তা। সঙ্গীতাংশটি পরিচালনা করেন পরেশ ধর, মাধুরী আচার্য ও অসীম মুখার্জী।"[৮৬]

৭. লীলা কোম্পানি নামে একটি শিল্পী দল ২-৩ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে কলামন্দিরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্পী দলে ছয়জন ছিলেন পাশ্চাত্যের আর ১২ জন ভারতের। অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করেন খ্যাতনামা মঞ্চ ও চিত্র প্রযোজক রঞ্জিতমল কাকোরিয়া। এ দলে ছিলেন পূর্ণদাস, দিলীপ ব্যানার্জী, মঞ্জু দাস, রুফাস কলিঙ্স, আলেকস হিপোলাইটস, গুরুকেল নায়ার প্রমুখ। কলকাতার পর মুম্বাই হয়ে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ রাশিয়া ও জাপান যাওয়ার পরিকল্পনাও তারা ঘোষণা করেন। কলামন্দিরে ১৭ অক্টোবর আরেকটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, 'দি ইংলিশ স্পিকিং ইউনিয়ন'। যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলো উদয় শংকর, ইন্ডিয়া

কালচার সেন্টার, ক্যালকাটা ইয়ুথ ক্যাডার ও বাংলাদেশের কিছু শিল্পী। টিকেটের হার ছিল ২৫, ১০ ও ৫ টাকা।[৮৭]

৮. সংগীত পরিচয় ২৮ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে পরিবেশন করে গান ও বাদ্যযন্ত্রের, অংশগ্রহণ করেন— স্বপন গুপ্ত, ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, মঞ্জুশ্রী, শিবকুমার ভট্টাচার্য, দীপক চৌধুরী ও ওস্তাদ বাহাদুর খান।[৮৮]

বিচিত্রানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের শিল্পী কল্যাণী ঘোষ-এর উদ্যোগে গঠিত হয় বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী। এক বিজ্ঞাপনে তারা জানান, বাংলাদেশের তরুণ বেতার শিল্পীদের কণ্ঠে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের গান, লোকগীতি, বাংলাদেশের কবিতা আবৃত্তি ও ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ের পটভূমির একটি গীতি-আলেখ্য তাঁরা পরিবেশন করতে পারবেন।[৮৯]

এবার ত্রিপুরার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন। বাংলাদেশ থেকে নামী বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন তারাও আলোচনায় অংশ নেন। এসব বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ কেনো সমর্থন করা উচিত তার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। নামী বুদ্ধিজীবী যারা আগরতলা এসে পৌঁছেছিলেন মে-মাসের মধ্যেই তাদের অনেকে কলকাতা চলে যান। ফলে, আলোচনা সভায় ভাটা পড়ে। কারণ, তখন যুদ্ধের কারণ সবার কাছে স্পষ্ট এবং শরণার্থী ব্যবস্থাপনা নিয়ে সবাই ব্যস্ত।

আলোচনা সভার সঙ্গেই কিন্তু সমান্তরালভাবে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর কিছু ছিল আলোচনার সভার সঙ্গে যুক্ত। কিছু ছিল টিকেট বিক্রি করে ত্রাণের জন্য অর্থ যোগাড়। ২৮ মার্চ পোস্টাফিস চৌমুহনীতেও কিন্তু, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্থানীয় শিল্পীরা যেমন এতে যোগ দিয়েছিলেন তেমন শরণার্থীরাও কয়েকটি 'দল' গঠন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছেন। বাংলাদেশের শিল্পীদের এই দলের কথা কিন্তু ত্রিপুরার সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়নি। এই সম্পর্কে আমরা জানতে পারি মামুন সিদ্দিকীর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে। এই প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করেই এসব সংগঠনের বিবরণ দেব।

সুখেন্দু চক্রবর্তী (১৯২৩-১৯৮০) ছিলেন কুমিল্লার গণসঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার। মে মাসের দিকে শরণার্থী হিসেবে চলে আসেন উদয়পুর। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, গোয়ালখালী ও ফেনীর কিছু শিল্পী পেয়ে যান আশেপাশে। গড়ে তোলেন 'স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা-সাংস্কৃতিক সংঘ।'

উদয়পুরের এ ডি এম ছিলেন শচীদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সুখেন্দুর পরিচয় ছিল। তিনি জানান, তিনি তাঁকে কিছু তহবিল দিতে পারবেন যদি এই সংঘ একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে। পালটানা ক্যাম্পের প্রধান ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর এ বিষয়ে আগ্রহ ছিল প্রবল। তাঁর সহায়তায় সংঘের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছাড়াও আরো যারা যুক্ত হন তারা হলেন— আবদুল্লাহ আল হারুন, আবদুল্লাহ আল নোমান, আবদুল মালেক উকিল, এবিএম তালেব আলী ও সালাউদ্দিন ইস্কান্দার। সভাপতি হন সুখেন্দু চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি নৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চৌধুরী।[৯০]

সংঘের কাঠামো যাই হোক সুখেন্দুর মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গান [প্রধানত গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত] গেয়ে শরণার্থীদের মনোবল চাঙ্গা রাখা। তারা আগরতলার বাইরে, পালটানা, কোনাবল, ধ্বজনগর, শিলপাড়া, রাজারবাগ, মাতারবাড়ি প্রভৃতি শরণার্থী ক্যাম্পে গান গেয়ে বেড়াতেন। যে গানগুলি বিশেষভাবে গাইতেন সেগুলি হলো—

১. যুদ্ধ যুদ্ধ বাংলায় যুদ্ধ
২. ইতিহাসে জান আমরা পরাজিত হইনি
৩. ওরা নাকি আমাদের ক্ষেতে
৪. যেয়ে দেখ পূবাকাশ লালে লাল হয়ে গেছে
৫. মাগো তোমার জন্য জীবন দিলাম
৬. ভয় কী মরণে
৭. ঐ না নদীর তীরে তীরে সবুজ শ্যামল গাঁওরে
৮. আমরা করিনা ভয়, অত্যাচারের হিমালয় ইত্যাদি।

রাজারবাগ শরণার্থী শিবিরে ইন্দিরা গান্ধী এলে সুখেন্দু চক্রবর্তী গান—

মুজিব বাইয়া যাওরে
নির্যাতিত জাতির ....
জনগণের নাওরে মাঝি
বাইয়া যাওয়া রে।

ইন্দিরা গান্ধী মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলেছিলেন— 'খুব আচ্ছা গায়া তুম।'[৯১]

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের অনেকে চলে গিয়েছিলেন আগরতলায়। কলেজটিলায় এম বি বি কলেজ ছিল তাদের মিলন কেন্দ্র। এখানে যারা জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে গঠন করেন 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থা'। এই সংস্থাটিকে অনেক সময় সরকারি সংস্থা হিসেবেও মনে করা হতো। কারণ, বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় জোনের প্রধান এম. আর. সিদ্দিকী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশেষ করে এম আর সিদ্দিকী সংস্থার কর্মকাণ্ডে আগ্রহ দেখাতেন বেশি। নৃত্যশিল্পী এ কে এম আজিজুল্লাহ ছিলেন এর আহবায়ক। শিল্পীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন হরিপ্রসন্ন পাল, অমল দত্ত, চিত্তরঞ্জন ভূঁইয়া, আশিক চৌধুরী, কামালউদ্দীন আহমদ, সালাম কবির, গীতশ্রী চৌধুরী, জয়শ্রী চৌধুরী, ছায়া রায়, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, জয়ন্তী ভূইয়া, নিয়তি ভূইয়া, বেণু চক্রবর্তী ও সৈয়দ মামুনুর রশীদ। "সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র-নজরুলের স্বদেশপিঠের গান, জাগরণী সঙ্গীত, প্রভৃতির মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি, শরণার্থীদের মনোবল অটুট রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনে মুক্তির আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ছিল এ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।"[৯২]

জুন মাসের ৭দিন [৩,৯,১৭,২২,২৪,২৫,২৭] মুক্তিফৌজের বিভিন্ন শিবিরে অনুষ্ঠান করে সংস্থা। বিজনা যুব শিবিরে **১১** আগস্ট ও তারা অনুষ্ঠান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ। অদিতরায় 'বিদ্রোহী' সংগীত পরিবেশন করেন। শচীন্দ্রলাল বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবার জন্য আমাদের সকলকেই অনেক ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় লেখা হয়— "গত একমাস ধরে মুক্তিফৌজের শিবিরে শিবিরে দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।...অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন শ্রী আজিজুল্লাহ চকলেট, শিল্প নির্দ্দেশনায় শ্রী শঙ্করনাথ সাহা।"[৯৩]

২৫ আগস্ট বাংলাদেশের এক মুক্ত এলাকায় সংস্থা অনুষ্ঠান করে। অঞ্চলের নাম জানা যায়নি। তবে ২৪ সেপ্টেম্বর সংস্থা মুক্তাঞ্চলে একটি অনুষ্ঠান করে তার প্রতিবেদন ছাপা হয় **১৫** অক্টোবর। প্রতিবেদন অনুসারে মুক্তিফৌজের একটি শিবিরে প্রায় পাঁচ হাজার মুক্তি সেনাদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠান হয়। "অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর বহু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার দুর্বার শপথে

মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করাই ছিল ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করেন বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সংগঠিত গীতি নকসা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সর্বাদিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রধান জনাব গোলাম রফিক।"[৯৪] [তবে, প্রতিবেদনটি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়]। প্রতিবেদনে আরো জানা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে সংস্থা তাদের 'কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে' **১৫** সেপ্টেম্বর একটি শোকসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এম বি বি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান রণেনদেব এবং অধ্যাপক মিহির দেব। সরোজকুমার চৌধুরী, এম এম মহসীন, আজিজুল্লাহ চকলেট প্রমুখ বক্তৃতা দেন।[৯৫]

মামুন সিদ্দিকী উল্লেখ করেছেন, পূর্বাঞ্চলে ২ ও ৩নং সেক্টরের প্রায় প্রতিটি যুব শিবির শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প/ শিবিরে সাংস্কৃতিক সংস্থা অনুষ্ঠান এই এলাকাগুলি ছিল উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ, হাতিমারা, বাগমারা, অম্পিনগর, বিশালগড়, লেম্বুচড়া, গোকুল নগর, দুর্গা চৌধুরী পাড়া প্রভৃতি। "আমাদের গানে", স্মৃতিচারণ করেছেন জয়শ্রী চৌধুরী, "সবাই একত্র হয়ে যেত। আবেগে আপ্লুত হয়ে কেউ কেউ কেঁদে উঠতো। মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল উঁচিয়ে উদ্দীপনায় শ্লোগান ধরতো 'জয় বাংলা'।" ভারতীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন ক্যাম্পে সংস্থার শিল্পীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।[৯৬]

কারা গাইতেন, কী গাইতেন, কী লিখতেন এসব নিয়েও একটি বিবরণ দিয়েছেন সিদ্দিকী। তিনি লিখেছেন, গানের পাশাপাশি থাকত নাটকের অংশ, গীতিনাট্য এবং ব্যঙ্গচিত্র। সব মিলে একটি প্যাকেজ। নাট্যাংশ ও গীতিনাট্য রচনার প্রধান ভূমিকা ছিল হারুনুর রশীদ ও সুধা কর। গান লিখেছিলেন—গজেন্দ্রলাল রায়, অসিত চৌধুরী, সুধাময় কর, সরদার আলাউদ্দিন, জীবন বর্মণ, মৃণাল কান্তি দত্ত, অমূল্য ভট্টাচার্য ও এ কে এম হারুনুর রশীদ। যে গানগুলি গাওয়া হতো তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাওয়া গেছে—

১. শক্ত হাতে-অসিত চৌধুরী
২. আমার পূরব বাংলাদেশ/ তোমায় সালাম নম নম-অসিত চৌধুরী
৩. চেয়ে দেখ পূবাকাশ লালে লাল- এ কে এম হারুনুর রশীদ
৪. লাল সবুজে জন্ম আমার- এ কে এম হারুনুর রশীদ

৫. লাল লাল রক্তে ভেসে গেছে জনপদ- জীবন বর্মণ
৬. ওরে ও মানুষের দ্বার খুলেছে- জীবন বর্মণ
৭. আমরা শপথ নিলাম একই মানে চলব-মৃণালকান্তি দত্ত
৮. এ লড়াই বাঁচার লড়াই- মৃণাল কান্তি দে
৯. ইতিহাস লিখেছি তো আমরা- মৃণাল কান্তি দে
১০. মানবোনা মানবোনা ইয়াহিয়া শাসন- মৃণাল কান্তি দে
১১. ঝঞ্জা ঝড় মৃত্যু
১২. যুদ্ধ এবার যুদ্ধ
১৩. ভাঙ্গবোই কারাগার ভাঙ্গবো

অনুষ্ঠানগুলির সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকতেন এস এম মহসীন। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন- "এম বি বি কলেজের নির্মীয়মান হোস্টেলে খড়ের উপর চাদর বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেই চলতো মহড়া, নারী শিল্পীদের অধিকাংশ কাছাকাছি কোনো শিবির কিংবা আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে থাকতো। অন্যেরা পর্দা টানিয়ে পৃথকভাবে বাস করতো। নিজেরাই রান্না করতো। এসব নিয়ে তাঁদের কোনো মনোবেদনা ছিল না।"[৯৭]

কুমিল্লার সঙ্গীত শিল্পী গীতিকার ও সুরকার কুলেন্দু দাস আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিম নোয়াবাদী শরণার্থী শিবিরে। তবলা বাদক শেফালি রায়-কে তিনি পেয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে গঠন করেন স্বাধীনতা সঙ্গীত দল। দলে ছিলেন কুলেন্দু দাসের পাঁচ সন্তান- কল্যান দাস, কনিকা দাস, বেবী দাস, কৃষ্ণ দাস, লিপিকা দাস। শেফালি রায়ের মেয়ে দিপালি রায়। এছাড়াও আরো ছিলেন নবীন কিছু শিল্পী। কুলেন্দু পুরনো গণসঙ্গীত গাইলেন না। নিজে লিখলেন ও সুর দিলেন গানগুলির। যেমন—

১. ভাগো ভাগো ইয়াহিয়া ভাগো
২. এইবার তিন শয়তানে লেজ উঠাইয়া ভাগেরে
৩. চাচার সাদ্দি ছাইড়া ভাগেরে কোনাইচ্যা পথে
৪. চাচা কি ভাব গো নিরালে বসিয়া
৫. ঐ মাটিতে সোনা ফলে
৬. হায়রে নিদয়া ইয়াহিয়া
৭. আমাদের বাঙলা মা স্বাধীন হলো রে, ইত্যাদি।[৯৮]

কুলেন্দু দাসের গান কি প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিল তার উদাহরণ সিদ্দিকীর নেয়া দুটি সাক্ষাৎকার—

"প্রত্যক্ষদর্শী বিধান চন্দ্র দাস গান ধরলে উদ্দীপনা তৈরি হতো, শিহরণ জাগতো। বিশেষ করে 'ধর ধর ধর ভুট্টোরো ধর' গানটি ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। কল্যান দাস বলছিলেন, 'চল ভাই মুক্তিফৌজে নাম লেখাই' গানটি শুনে শরণার্থী শিবিরের অনেক তরুণ ও যুবক মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে যাওয়ার জন্য যুবশিবিরে চলে গিয়েছিল। গানগুলির প্রতিটি অক্ষর আজ রক্তঝরা দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৯৯]

বাংলাদেশীদের গড়া আরেকটি সাংস্কৃতিক দলের নাম পাই পত্রিকায়। প্রতিবেদন অনুসারে ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়. 'বাংলাদেশ শিল্পী সংসদ'। এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে- আব্দুর রাজ্জাক এমএলএ এবং আবদুল মতিন।

"বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে জোরদার করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য বলে সভাপতি জনাব আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন।"[১০০]

শিল্পী সংসদের একটি অনুষ্ঠানের খবর পাই। ১৫ নভেম্বর সূর্য্যমনী নগর বিশেষ শরণার্থী শিবিরে তারা এক গণসঙ্গীতের আয়োজন করে।[১০১]

ত্রিপুরা শিল্পী সন্ধানীগোষ্ঠীও গঠিত হয় জুন মাসে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য। ৬ জুন তারা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। টিকেট বিক্রির টাকা তুলে দেন ত্রিপুরার গভর্ণরের স্ত্রী 'শরণার্থী' ত্রাণ মহিলা সমিতি'র সভানেত্রী শ্রীমতী ডায়াসের হাতে। তিনি এর সঙ্গে আরো ২০ টাকা যোগ করেন নিজের দান হিসেবে। সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ ত্রাণ কমিটিতে দান করা হয়, বাকী টাকা "অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদেরও নগদ পারিতোষক" দেয়া হয়।[১০২]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের শিল্পীদের সহায়তার প্রসঙ্গটি আসতে পারে। স্থানীয় সাংবাদিক বিকশ চৌধুরী খবর পেলেন আবদুল জব্বার আগরতলা এসেছেন। 'কেয়ার এন্ড কিয়োর' নার্সিং হোমের বাড়িটি ছিল সহায়তা কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়। বাড়ির গ্যারেজে খোঁজ পেলেন আবদুল জব্বারের। জব্বার জানালেন, তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন শিল্পী আছেন- আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায়, গীতিকার শহিদুল ইসলাম ও টেলিভিশনের আরো কয়েকজন শিল্পী। তাঁরা তখন নিঃস্ব। বিকচ তাদের আশ্বাস দিলেন কিছু একটা করবেন। তাদের নিয়ে রাস্তায় বেরুতেই দেখলেন আলোকচিত্রি রবিন দাশগুপ্ত তার ফিয়াট চালিয়ে আসছেন। গাড়ি থামিয়ে রবিন

দাশগুপ্তকে সব জানালে তিনি তাদের গাড়িতে তুললেন। তারপর একটি বাড়ির কাছে গিয়ে দুটি ঘরের তালা খুলে দিলেন। বিকচের এক বন্ধু কয়েকটি সতরঞ্জি ও মশারি এনে দিলেন। থাকার ব্যবস্থা হলো এখন আহার ও অন্যান্য খরচ। বিকচ লিখেছেন–

"প্রথমদিকে কয়েকদিন আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িতে আপ্যায়ন ও নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হলো এবং বিশ্বদেবের [তবলা বাদক ও বিকচের বন্ধু] এবং আমার সামর্থ্য অনুযায়ী হাত খরচের টাকা আনার ব্যবস্থা করলাম। তারপর শুরু হলো নানা যায়গায় ঘরোয়া অনুষ্ঠান করে শিল্পীদের "সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ।"[১০৩]

বিকচ চৌধুরী আরো জানিয়েছেন শিল্পীদের সহায়তার জন্য দুটি বড় মাপের অনুষ্ঠান করেছিলেন একটি তুলসীবতী স্কুলে যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। আরেকটি তৎকালীন টাউনহলে। গান গেয়েছিলেন আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায় ও স্থানীয় কয়েকজন শিল্পী। "অনুষ্ঠানের আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী কবরী চৌধুরীর অংশ গ্রহণ।"[১০৪] এরপর কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হলে এরা সবাই কলকাতা চলে যান।

ত্রিপুরার রবীন্দ্র পরিষদ ১৫ মে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে ৭ দিনের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাতে প্রথম দিন ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান। "তৃতীয় পর্যায় সারা ত্রিপুরা সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা। প্রতিযোগীতার বিষয় ছিল পূর্ববাংলা মুক্তি সংক্রান্ত।" প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেয়া হয়েছিল।[১০৫]

১২

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলির কথা বললাম। এর বাইরেও বিভিন্ন রাজ্যে নিশ্চয় এধরণের অনুষ্ঠান হয়েছে। এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সে সব সংবাদ ছাপাও হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা না জানার কারণে সে সব তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র বোম্বাইয়ের একটি জলসার কথা জানি যেখানে বাংলাদেশের জন্য একটি গান লিখেছিলেন শচীন দেব বর্মনের স্ত্রী মীরা বর্মন আর গানটি গেয়েছিলেন শচীন কর্তা নিজে।

শরণার্থী যখন আসছে তখন মুম্বাইয়ের বাঙালিরা কি পিছিয়ে থাকতে পারেন? না পারেন না। মুম্বাইর বিভিন্ন সমিতি, ক্লাব একত্রিত হয়ে গঠিত করল 'বৃহৎ বোম্বাই বাঙালি সমাজ'। আহবায়ক নির্বাচিত হলেন হিতেন চৌধুরী। শরণার্থীদের সাহায্যার্থে তারা ঠিক করলেন আয়োজন করবেন এক

সঙ্গীতানুষ্ঠানের। হিতেন চৌধুরীর অনুরোধে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হলেন শচীন দেববর্মন বা শচীন কর্তা, হেমন্তকুমার, মান্না দে, শর্মিলা ঠাকুর, সলিল চৌধুরী, হেমা মালিনী, দিলীপ কুমার, রাজেশ খান্না, মান্না দে, সায়রা বানু, বিশ্বজিৎ প্রমুখ। কলকাতা থেকে এলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩,০০০ দর্শক।

সেদিন অনেকেই গেয়েছেন, মঞ্চে উঠেছেন কিন্তু মাতিয়ে দিলেন পূর্ববঙ্গের শচীন কর্তা। বললেন তিনি, "আমার মনেই হচ্ছে না যে আমি এখানে ৩,০০০ শ্রোতার সম্মুখে বিরাট প্রেক্ষাগৃহে বসে আছি। মন চলে গেছে ৫০ বছর আগে যখন ১২ বছরের এক বালক 'শচীন' কুমিল্লার ময়নামতীর ধারে ঘুরে বেড়াত। সরস্বতী পূজার জন্য ফুল চুরি করত। সেই সব স্থানে এই মুহূর্তে ইয়াহিয়া খানের বর্বর সৈন্যরা সেই সোনার বাংলার শান্তিপূর্ণ শান্ত, সবুজ পরিবেশকে ধ্বংস করেছে, নিরস্ত্র নিরপরাধ অসহায় স্ত্রী পুরুষ শিশু বৃদ্ধদের হত্যা করেছে অতি আধুনিক সব মারণাস্ত্র দিয়ে।"

প্রথমে শচীন দেব গাইলেন তাঁর একটি প্রিয় গান- 'নিশীথে যাইও ফুলবনে।' বললেন, গানটি লিখেছেন তাঁর বন্ধু জসিমউদ্দীন। সুর দিয়েছেন তাঁর আরেক বন্ধু, কুমিল্লার মনসুর আলী।

এই গানটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন জাকির হোসেন। শচীন কর্তা তারপর বললেন, "বাংলাদেশের ঢোল তাঁর এক অতি প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রে নানারকম বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষের তুলনা নেই। শতশত ধরনের যন্ত্র আছে এ দেশে, যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।" তিনি আরো বলেন, তার পুরনো একটি গানের নতুন সংস্করণ করেছেন তাঁর স্ত্রী মীরা দেবী। সে গানটি তিনি গাইবেন। আর ঢোল বাজাবেন অবনী দাশগুপ্ত। তার পর গাইলেন—

(আমি) তাক্দুম তাকদুম বাজাই
অখণ্ড এই ঢোল
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা,
বাংলা মায়ের কোল
(আমি তাক্দুম তাক্দুম বাজাই)
বাংলাদেশের ঢোল।
যে জমিন জনম দিল আমারে
মায়ের পরাণ আমার পরাণ
সেই জমিনেই বাঁধা রে

সেই সোহাগের ডোর ছিঁড়িবার সাধ্য
কারো নাই।
সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না
বাংলা মায়ের কোল
আমাদের মশাল কভু নেভেনা
মুজিবুরের ভাই আমরা বাঁচতে জানি মরি না
মেঘনা, তিতাস আর আমাদের
পদ্মার গান গাই।
সব ভুলে যাই তাও ভুলি না,
বাংলা মায়ের কোল।

গাইতে গাইতে শচীন কর্তা তাঁর প্রিয় শিল্পী মান্না দে-কে ডাকেন যোগ দিতে, বলরাজ সাহানী-কে ডাকেন হিন্দিতে গানের মানে বুঝিয়ে দিতে। মাতিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন শচীন কর্তা সবাইকে। তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে অবনী দাশগুপ্তের বাংলাঢোলের তাক্‌দুমাদুম ঢ্যান কুড়কুড় বোম্বের প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ পাল্টে দিয়েছিল।

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় নির্মলেন্দু চৌধুরীর চারটি গান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ডা. রফিক জাকারিয়া বলেন— "আমাদের অসহায়ভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে পাকিস্তানি বর্বরতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা অতি লজ্জার কথা। ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।"[১০৬]

মুসলমানরা কুণ্ঠিত ছিল বাঙালিদের সাহায্যের ব্যাপারে। বোম্বাইয়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য যে কমিটি হয়েছিল তারা বিখ্যাত উর্দু কবি আলি সর্দার জাফরী, কাইফি আজমী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধ করেন মুসলমানদের নীরব না থাকার জন্য। তাদের মনোভাব দেখে মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। উর্দু ভাষীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় কাওয়ালি গায়ক ইউসুফ আজাদ ও রশিদা খাতুন বাংলাদেশের সাহায্যার্থে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে এগিয়ে আসেন। এরপর থেকে সর্বত্র এমনকী মুসলমান সমাজের মধ্যেও বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত সংহত হতে থাকে।[১০৭]

***গানের আবেদন সর্বজনীন যা আগে উল্লেখ করেছি। ভাষা না বুঝলেও তাল, লয় মানুষকে আগ্রহী করতে পারে। গান এতটা প্রভাব ফেলে যে, অনেক সুর লুপ্ত থাকে, এক বা দু' দশক পরও অভিঘাতে দেখা যায় সে সুর ফিরে এসেছে মনে, গুনগুন করে আপনমনে তা পুনরুজ্জীবিত করে।

সিকান্দার আবু জাফরের 'জনতার সংগ্রাম চলবে' পঞ্চাশ বছর আগের গান, এখনও মিছিলে মিছিলে তা ফিরে আসে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, সামগ্রিকভাবে গান যেভাবে প্রণোদনা যুগিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে অন্য কোনো মাধ্যমে সেভাবে প্রণোদনা যুগিয়েছিল কিনা সন্দেহ। বাংলা গান প্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণী কলকাতা। বলা যেতে পারে এ দু'টি বেতার কেন্দ্র লড়াইয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বিদেশে জোন বায়েজ বা হ্যারিসন ও অন্যদের কনসার্ট তরুণদের শুধু আন্দোলিতই করেনি, আজকের ভাষায় আমরা যে 'ব্র্যান্ডিং' প্রত্যয়টি ব্যবহার করি সেই ব্র্যান্ডিংয়ের কাজ করেছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে গানের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। গত শতকে ৪০ দশকে গানে যেমন সৃজনশীলতার সৃষ্টি করেছিল ১৯৭১-এ সেই সৃজনশীলতার জোয়ার আবার ফিরে এসেছিল। এক্ষেত্রে, একদিকে, কলকাতার শিল্পীরা সম্মিলিতভাবে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।

দিলীপ চক্রবর্তী সেই সব দিনগুলি স্মরণ করে লিখেছেন, "এপার বাংলা ওপার বাংলার শিল্পীদের গাওয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গানের রেকর্ড আর ক্যাসেট বাজানো হতো। ভূপেন হাজারিকার গলায় 'জয় জয় মুক্তি বাহিনী' কিংবা 'পদ্মা আমার মা গঙ্গা আমার মা', শ্যামল মিত্রের গলায় 'আমরা সবাই বাঙালি', সলিল চৌধুরীর লেখা ও সুর 'একটি সূর্যোদয়ের ভোরে এসো আজ', গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের লেখা ও অংশুমানের গলায়, 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ' প্রভৃতি। পশ্চিম বাংলার শিল্পীদের গানের রেকর্ড তখন বেরিয়েছে।... এছাড়া গোবিন্দ হালদারের লেখা বাংলাদেশের আপেল মাহমুদের গলায় 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', সমর দাসের সুরে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল', আনোয়ার পারভেজের 'জয় বাংলার জয়', স্বপ্না রায়-এর 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে', সিকান্দার আবু জাফরের লেখা 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে' প্রভৃতি তখন এখানে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

ক্যাসেটবন্দি হয়ে এগুলি পূজা মণ্ডপে বাজানো হচ্ছিল।[১০৮]

তথ্যপঞ্জি

১. বিস্তারিত হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ্গ বাইয়া*, কলকাতা, ১৯৯০।

২. অনুরাধা রায়, সংকলিত ও সম্পাদিত, *স্বাধীনতা সংগ্রামের গান ও কবিতা*, দিল্লি, ১৯৯৯, পৃ. ৪৩৩।

৩. *ঐ, ভূমিকা*।

৪. মুনতাসীর মামুন, *ভিনদেশীদের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৮।

৫. *ঐ।*

৬. বিস্তারিত, নাইমা নিজাম, 'নিখোঁজ পরম আত্মীয়', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৫. ৩. ২০১১।

৭. *ঐ।*

৮. কামাল আহমেদ, 'কনসার্ট ইন সিমপ্যাথিতে ধ্বনিত হয়েছিল আকার বিজয়ী যে অভিনেত্রীর কণ্ঠ', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৪.৯.২০২১।

৯. *Morning Star*, London, 27.10.1971.

১০. কামাল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

১১. *Morning Star, opcit.*

১২. *Bangladesh Newsletter*, 10.12.1971.

১৩. কামাল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

১৪. ব্যান্ড দলগুলির পরিচয় নেয়া হয়েছে *অন্তর্জাল* থেকে।

১৫. বিস্তারিত দেখুন, মতিউর রহমান, 'গুডবাই সামার কনসার্ট ফর বাংলাদেশ', *প্রথম আলো*, ঈদ সংখ্যা, ২০২১; এ কনসার্ট সম্পর্কে মতিউর রহমানই প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১৬. Chris Charlesworth, 'The who and faces at oval' A blog, www.wkrock *festivals.com/goodbye-summer-1971.html.*

১৭. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*।

১৮. *Morning Star*, London, 20.8.1971.

১৯. AMA Muhit, *American Response to Bangladesh Liberation war*. Dhaka, 1996.10.19

২০. *Bangladesh Newsletter*, 20.8.1971.

২১. *ঐ।*

২২. AMA Muhit. *Opcit.*

২৩. বিস্তারিত, *Two Friends, one cause : Remembering the concert for Bangladesh.* Dhaka, 2013.

২৪. রবিশঙ্কর, *রাগ— অনুরাগ*, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮৯- ১৯১।

২৫. *Two Friends*. Page. 29.

২৬. বিস্তারিত, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, 'যেভাবে হলো কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'; সোহরাব হাসান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৯৯।

২৭. *ঐ।*

২৮. *ঐ।*

২৯. উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে, *Two Friends, one cause* থেকে।

৩০. *Bangladesh Newsletter*, 10.11.1971.

৩১. *ঐ।* 25.9.1971

৩২. বিস্তারিত মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ: একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ*, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২৯০।

৩৩. *ঐ*, পৃ. ৪৮১।

৩৪. বিস্তারিত, আসদুল হক, *পথিক ওগো চলছে পথে*, ঢাকা ২০১১।

৩৫. এ তালিকা করা হয়েছে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ/ প্রবন্ধ থেকে। যেমন, ফকির আলমগীর, *গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ২০১০; সেলিম রেজা সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা, ১৯৮৮; রাজীব মীর ও সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত, *মুক্তির ভাষা; স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা ২০১৬; বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা, ১৯৮৩; জাহিদ হোসেন সম্পাদিত, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা, ২০০৮ ইত্যাদি।

৩৬. *ঐ।*

৩৭. উদ্ধৃত, অনুরাধা রায়, *প্রাগুক্ত*।

৩৮. *ঐ।*

৩৯. *ঐ।*

৪০. *ঐ।*

৪১. *ঐ।*

৪২. বিস্তারিত বেলাল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*।

৪৩. *ঐ*।

৪৪. সেলিম রেজা, *প্রাগুক্ত*।

৪৫. *কালান্তর*, ৩. ৬. ১৯৭১।

৪৬. বেলাল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।

৪৭. রূপ ফরহাদ, '১৯৭১ এর স্মৃতি'। জাহিদ হোসেন সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*।

৪৮. দিলীপ চক্রবর্তী, *একাত্তরের রাতদিন*, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৬৯।

৪৯. *দৈনিক কালান্তর*, ২১.৪.১৯৭১।

৫০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সন্‌জীদা খাতুন, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে*, ঢাকা, ২০১৩।

৫১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সনজীদা খাতুন, *প্রাগুক্ত*।
বাংলাদেশ সহায়ক শিল্প-সাহিত্যিক সমিতির নিবেদন :
রবীন্দ্র সদন
৩রা জুলাই, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা
॥এই প্রথম॥

➢ দেশ বিভাগের পরে সীমান্ত পারের সঙ্গীত— শিল্পীদের এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দল ভারতবর্ষে, কলকাতা শহরে, এই প্রথম গান গাইছেন।

➢ গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষিত হওয়ার পর নবজাত রাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলের শিল্পীরা এই প্রথম এক জায়গা মিলিত হয়েছেন এবং পঁচিশে মার্চের রক্তাক্ত দিনগুলি অতিক্রম করে বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছেন তাঁদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠান:

: রূপান্তরের গান :
১৯৪৭ সাল থেকে যে গানগুলি গেয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' এই ১৯৭১ সালে অমোঘ 'বাংলাদেশ'—এ পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও পরবর্তী কবিদের লেখা এমন তেরোটি গানের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করবেন: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা বেতারকেন্দ্রের প্রায় তিরিশ জন প্রবীণ ও নবীন কণ্ঠশিল্পী।
পরিচালনা: স্বনামধন্য সন্‌জিদা খাতুন।
সূত্রধার: চলচ্চিত্র জগতের যশস্বী নট— হাসান ইমাম।

➢ বাংলাদেশ এর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর এই প্রথম একটি নাটক লিখলেন বাংলাদেশ—এর তরুণ নাট্যকার শাহরিয়ার কবির এবং সেটি মঞ্চস্থ করছেন বাংলাদেশ—এরই প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পীরা:
— সূর্যের প্রার্থনা—
তাছাড়া
বাংলাদেশ—এর লোকগীতির নির্বাচিত অনুষ্ঠান এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের একক কণ্ঠ—সঙ্গীত।
রবীন্দ্র সদন * চৌঠা জুলাই রবিবার* সকাল ৯টা
॥ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ॥
শান্তিদেব ঘোষ। সুচিত্রা মিত্র। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। নীলিমা সেন। সাগর সেন।
: আবৃত্তি:
শম্ভু মিত্র। তৃপ্তি মিত্র। অর্পনা সেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব ঘোষ।
সেই সঙ্গে—
বাংলাদেশ-এর শিল্পীদের বিশেষ অনুষ্ঠান
দৈনিক টিকেটের হার: ২৫টাঃ, ১০টাঃ, ৫টাঃ, ৩টাঃ।
প্রাপ্তিস্থান : রবীন্দ্র সদন। স্টাইলো (গড়িয়াহাট)। মেলডি (রাসবিহারী)। বাংলাদেশ— সহায়ক শিল্প সাহিত্যিক— বুদ্ধিজীবী সমিতি(১৪ লেনিন সরণী)। মনীষা (কলেজ স্ট্রীট)।
বিজ্ঞাপন: *দৈনিক কালান্তর* ১.৭.১৯৭১।

৫২. বিস্তারিত। সনজীদা খাতুনের *প্রাগুক্ত* গ্রন্থ।
৫৩. *দৈনিক কালান্তর*। ৪.৭.১৯৭১।
৫৪. *ঐ*

সংগ্রামী বাঙলার সাহায্যে সঙ্গীত অনুষ্ঠান

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৩ জুলাই— আজ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী—সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির উদ্যোগে সংগ্রামী বাংলাদেশের সাহায্যে দুদিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীদীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রারম্ভিক ভাষণে এই শিল্পী সমাবেশের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণিত হবার পর সভানেত্রী তাঁর সুমধুরকণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বর্ষা—বাদল সত্ত্বেও প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল অনুষ্ঠানে।

দেশ বিভাগের পর এই প্রথম ওপার বাংলায় বিভিন্ন অংশের সঙ্গীতশিল্পীরা কলকাতায় একত্র মিলিত হয়েছেন বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণার ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায়। তাঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্র নজরুল ও অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। এ বাংলার প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসও তিন খানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সর্বশেষে অপূর্ব মঞ্চসজ্জার পরিপ্রেক্ষিতে স্বনামধন্যা সনজীদা খাতুনের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী কবিদের তেরটি রচনার ভিত্তিতে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে 'রূপান্তরের গান' পরিবেশিত হয়। এই গানগুলির ভিতর দিয়ে ১৯৪৭ থেকে একদার পূর্ব পাকিস্তান কীভাবে ১৯৭১ সালে কীভাবে স্বাধীন দুর্জয় বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে তার ইতিহাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।
রবিবার সকাল ৯টায় রবীন্দ্রসদনে সূর্যের প্রার্থনা এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।
দৈনিক যুগান্তর, ৪.৭.১৯৭১।

৫৫. বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে খুশী হয়েছি। বাংলার মুক্তি— সংগ্রামী জনগণের জন্যে আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য ধন্যবাদের অনেক উর্দ্ধে এ সবের জন্যে আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
পাকিস্তানে জঙ্গীশাহীর চক্রান্তে বাংলাদেশে যে নৃশংস গণহত্যা চলেছে তা আপনাদের অজানা নয়। পাকসেনারা বাঙলার মাটিতে যে বীভৎস নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা করছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।
জাতির গণমুক্তি আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের দান অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য। মুক্তি- আন্দোলনে মসী— অসির চাইতে বড়। অসি আমাদের বেশি নেই; তাই মসীর দরকার আরও বেশি।
আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে রক্ত দিয়েছি এবং আরও দেব। কিন্তু এ রক্তক্ষয় যত সম্ভব কম হয় তার জন্যে মসীর প্রয়োজন আরও অধিক। ভিয়েতনামের মাই— লাই— এর নারকীয় ঘটনায় সারা বিশ্বে চমক ভেঙ্গেছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় অথচ দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশে মাই— লাই— এর মত শত শত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বিশ্বের বিবেক বিচলিত হচ্ছে না। তাই আপনাদের তৎপরতার আরও প্রয়োজন আছে। আপনারা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলুন ও বাংলাদেশের ঘটনাকে দেশে দেশে পৌঁছে দেবার আরও প্রচেষ্টা চালান। বিশ্ব—বিবেক জাগিয়ে তুলুন ও চাপ সৃষ্টি করুন।
পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গণ—জাগরণে দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ ব্যাপারে আপনারা অনেক করেছেন এবং করবেন আশা করি। আমার একান্ত বিশ্বাস বাংলাদেশের মুক্তি-পাগল মানুষের জন্য আপনাদের প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না। বরং এ প্রচেষ্টা মুক্তি—সংগ্রামের পথকে আরও প্রশস্ত করবে।

পাকিস্তান সরকার বিদেশ থেকে যত আধুনিক সমরাস্ত্র আমদানী করুক না কেন স্বাধীনতাকামী বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দুর্বার অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তিরই নেই।

বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতার যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তাতে অচিরেই জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ইনসাআল্লাহ। তার কারণ, আমাদের সংগ্রাম ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম। যেহেতু কোনো স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি— আমাদেরও বৃথা যাবে না।

হোসেন আলীর লিখিত ভাষণ, *দৈনিক কালান্তর*, ১৮.৭.১৯৭১।

৫৬. সনজীদা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
৫৭. *দৈনিক কালান্তর*, পৃ. ১৮.৭.১৯৭১
৫৮. দিলীপ চক্রবর্তীর *প্রাগুক্ত গ্রন্থ* ও অমর সাহার গৃহীত সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*।
৫৯. কবরী, *স্মৃতিটুকু থাক*, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭১- ৭২।
৬০. দিলীপ চক্রবর্তীর *গ্রন্থ* ও অমর সাহার সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*।
৬১. গোলাম মুরশিদ, *যখন পলাতক, মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬২-৬৩।
৬২. *দৈনিক কালান্তর*, ২৯. ১২.১৯৭১
৬৩. বিস্তারিত অমর সাহা, *প্রাগুক্ত।*
৬৪. *ঐ।*
৬৫. *ঐ।*
৬৬. *ঐ*।
৬৭. অমর সাহা, 'গোবিন্দ হালদার' *প্রাগুক্ত*।
৬৮. *ঐ*।
৬৯. *দেশ*, ১১ আষাঢ় ১৯৭৮।
৭০. *ঐ।*
৭১. *ঐ।*
৭২. আশিষ তরু মুখোপাধ্যায়, *মাঝি বাইয়া যাওরে, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১১৮।*
৭৩. বিস্তারিত, সুবিমল ভট্টাচার্য, 'মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি চর্চা, *স্মরণিকা*, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘ, ২০০১।
৭৪. *ঐ*।
৭৫. *ঐ*।
৭৬. *ঐ*।
৭৭. কবরী, *স্মৃতিটুকু থাক*, ঢাকা, ২০১৭
৭৮. *ঐ*।
৭৯. *দৈনিক যুগান্তর*, ১.৭.১৯৭১
৮০. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৫.৫.১৯৭১
৮১. *ঐ*।
৮২. *দৈনিক কালান্তর*, ২৩.৬.১৯৭১
৮৩. *দৈনিক যুগান্তর*, ১.৭.১৯৭১
৮৪. *ঐ*, ২৮.৮.১৯৭১
৮৫. *ঐ*, ৪.৯.১৯৭১
৮৬. *ঐ*, ১২.১০.১৯৭১
৮৭. *দেশ*, ২৩.১০.১৯৭১
৮৮. *দৈনিক যুগান্তর*, ১০.১১.১৯৭১
৮৯. *দৈনিক কালান্তর*, ২৬.১১.১৯৭১
৯০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মামুন সিদ্দিকী, 'মুক্তিযুদ্ধে তিনটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, *স্মরণিকা ২০১৪*, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ঢাকা, ২০১৪।
৯১. *'দৈনিক সংবাদ'*, উদ্ধৃত, সুকুমার বিশ্বাস, সংকলিত, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র, ঢাকা, ২০০৭।*
৯২. *ঐ।*
৯৩. *ঐ।*
৯৪. *ঐ।*
৯৫. *ঐ।*
৯৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য। বিকচ চৌধুরী, *লক্ষ মুঠিতে ঝড়ের ঠিকানা*। আগরতলা, ২০০৩।
৯৭. *ঐ।*
৯৮. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০০।
৯৯. *ঐ।*
১০০. *ঐ, পৃ. ৮০১।*
১০১. *দৈনিক সংবাদ*, ৪.৮.১৯৭১।
১০২. বিস্তারিত, আবুল আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ভূমিকা*, ঢাকা ২০০৪
১০৩. বিকচ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*।
১০৪. *ঐ।*
১০৫. উদ্ধৃত, সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত।*
১০৬. সলিল ঘোষ, 'বোম্বাইর সঙ্গীতানুষ্ঠানে শচীন দেববর্মন', *দেশ*, পৌষ, ১৩৭৮।
১০৭. দিলীপ চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত।*